ফাদার ব্রাউনের রহস্য গল্প



সুমিত বর্ধন

ফাদার ব্রাউনের রহস্য গল্প

জি কে চেস্টারটন

ভাবানুবাদ ঃ

সুমিত কুমার বর্ধন

◆ প্রথম প্রকাশ ◆
বইমেলা, জানুয়ারী, ২০০৩

◆ প্রকাশিকা ◆
শ্রীমতী অপর্ণা বর্ধন
প্রথম প্রকাশন
৬২এ, রাণী হর্ষমুখী রোড, কলকাতা-৭০০ ০০২

◆ প্রিন্টিং ◆
ট্রায়ো প্রসেস
কলকাতা - ৭০০ ০১৪

◆ অলঙ্করণ ◆
শুভব্রত চন্দ্র

দাম ঃ ৬০ টাকা

সূচিক্রম ঃ

নীল ক্রুশ

রুপোলি ফিতের মত আকাশ আর ঝকঝকে সবুজ ফিতের মত সমুদ্রের মাঝের ফাঁকটুকু দিয়ে জাহাজ ভিড়ল হারউচের ঘাটে। পিঁপড়ের মত পিলপিল করে নেমে এল একদল মানুষ। এদের মধ্যে আমাদের দরকার এমন একটি লোককে যাকে ভিড়ের মধ্যে আলাদা করে চেনা মুস্কিল। কারণ এর চেহারায় আলাদা করে নজরে পড়ার মত বড় একটা বৈশিষ্ট কিছু নেই। শুধু খুব ভাল করে নজর করলে বড় জোর এনার ছুটির মেজাজের পোষাক আর হাল্কা অফিসার সুলভ ভারিক্কী চেহারার মধ্যে একটা হাল্কা বৈসাদৃশ্য চোখে পড়তে পারে।

পরিধানে তাঁর হাল্কা রঙের পরিচ্ছদ - ধূসর কোট, সাদা ওয়েস্ট কোট আর নীলচে ধূসর ফিতে দিয়ে বাঁধা খড়ের রুপোলী টুপি, তার সঙ্গে ঈষৎ বেমানান শ্যামল কৃশ বদনমণ্ডল আর মিশকালো ঘন স্প্যানিশ দাড়ি। সিগারেট টানার অলস মন্থর ভঙ্গীমা থেকে বোঝার উপায় নেই যে ওই ধূসরকোটের নিচে লোকানো আছে গুলিভর্তি রিভলভার, ওয়েস্ট কোটের নিচে চাপা আছে পুলিশের কার্ড আর খড়ের টুপির নিচে ঢাকা আছে ইউরোপের অন্যতম মেধা। ইনি হলেন পৃথিবী বিখ্যাত গোয়েন্দা ভ্যালেন্টিন, প্যারিস পুলিশের খোদ বড়কর্তা স্বয়ং এবং ব্রাসেলস থেকে লণ্ডনে এনার পদার্পণ শতাব্দীর সব সেরা গ্রেপ্তারটি করার জন্যে।

ফ্ল্যাম্বোর ইদানীং আস্তানা লণ্ডন। তিনতিনটে দেশের পুলিশ তাকে তাড়া করে বেড়িয়েছে গেন্ট থেকে ব্রাসেলস আর ব্রাসেলস থেকে হল্যাণ্ডের হুক অবধি। সবার এবার সন্দেহ সে লণ্ডনের খ্রীষ্টিয় সম্মেলনের ভিড় আর গোলমালে গা ঢাকা দেবে — হয়ত বা পাদ্রী সেজেই। অবশ্য সন্দেহই। ফ্ল্যাম্বোর সম্বন্ধে সঠিক কেউ কিছু বলতে পারে না — ভ্যালেন্টিনও না।

অপরাধ জগতের প্রবাদপুরুষটি অবশ্য বেশ কয়েকবছর হল তার উপদ্রব বন্ধ রেখেছে। দুনিয়ায় শান্তি ফিরেছে তার অবসর গ্রহণের সাথে সাথে। কিন্তু কর্মজীবনের মধ্যগগনে তার কলাকুশলতার খ্যাতি ছিল সুদুরপ্রসারী - কাইজারের থেকে কোন অংশে কম নয়। প্রতিদিন সংবাদপত্রে ফলাও করে ছাপা হত তার এক অপরাধের পরিণামকে আর এক অপরাধ করে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানোর গল্প। দানবাকৃতি এই গ্যাসকনটির আসুরিক বল নিয়েও চালু ছিল নানা কিংবদন্তী। একবার এক হাকিমকে নাকি উল্টে রেখেছিল মাথার ওপরে - মগজ সাফ হবে

বলে। আর একবার নাকি দুই হাতে দুই পুলিশকে বগলদাবা করে ছুট দিয়েছিল রু দ্য রিভোলি ধরে।

আইনকে বেইজ্জত করলেও কখনো রক্তপাত করে শক্তির অপপ্রয়োগ করেনি সে। শুধু লোক ঠকিয়েছে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জোরে। প্রতিটি অপরাধ করেছে এমন নতুন পদ্ধতিতে যে প্রতিটি নিয়ে এক একটি গল্প লেখা চলে। যেমন একবার লণ্ডনের বুকে বসে চালিয়েছিল দুধের ব্যবসা টাইরোলীন ডেয়ারী কোম্পানী। এ কোম্পানীর না ছিল গরু, না ছিল খাটাল আর না ছিল দুধের গাড়ি — কিন্তু ছিল কয়েক হাজার খদ্দের। খদ্দেরদের দুধ দিতে স্রেফ তুলে আনা হত অন্য লোকের দরজার সামনে রাখা দুধের ক্যান। আর একবার এক তরুনীর চিঠিপত্রের ওপর কড়া নজরদারি সত্ত্বেও তার সাথে পত্রালাপ জারি রেখেছিল আনুবীক্ষনিক আকারে তোলা চিঠির ফটোগ্রাফের সাহায্যে। তবে বেশীর ভাগ সময়েই ফ্ল্যাম্বো কার্যোদ্ধার করেছে নিপাট বুদ্ধির খোঁচায়। যেমন একবার রাতদুপুরে রাস্তার সব বাড়ির নম্বর পাল্টে ফেলেছিল এক যাত্রীকে ফাঁদে ফেলবে বলে। কখনো বা রাস্তার মোড়ে মোড়ে বসিয়ে রেখেছিল ভুয়ো লেটার বক্স, যাতে লোকে ভুলে তাতে মানিঅর্ডার ফেলে। সর্বোপরি ফ্ল্যাম্বো ছিল তুখোড় বাজীগর। গুরুভার চেহারা সত্ত্বেও ফড়িঙের মত লাফিয়ে উঠত গাছে - চোখের পলক ফেলার আগেই মিলিয়ে যেত বাঁদরের মতন।

এহেন ফ্ল্যাম্বোকে সনাক্ত করতে পারলেও যে সহজে কার্যসিদ্ধি হবে না তা ভ্যালেন্টিন কাজে নামার আগে থেকেই ভাল করে জানেন। কিন্তু কিভাবে সন্ধান পাওয়া যাবে ফ্ল্যাম্বোর? এই ভেবেই সারা হচ্ছিলেন গোয়েন্দা চূড়ামণি ভ্যালেন্টিন। অবশ্য ফ্ল্যাম্বো যতই ছদ্মবেশই ধরুক না কেন তার ওই সুদীর্ঘ চেহারা লোকানো সম্ভব নয়। লম্বা কাউকে দেখলেই ভ্যালেন্টিন তাকে গ্রেপ্তার করতে দ্বিধা করবেন না — তা সে আপেল বিক্রেতা মেয়েমানুষ, সেপাই কিম্বা সম্ভ্রান্ত মহিলাই হোক না কেন।

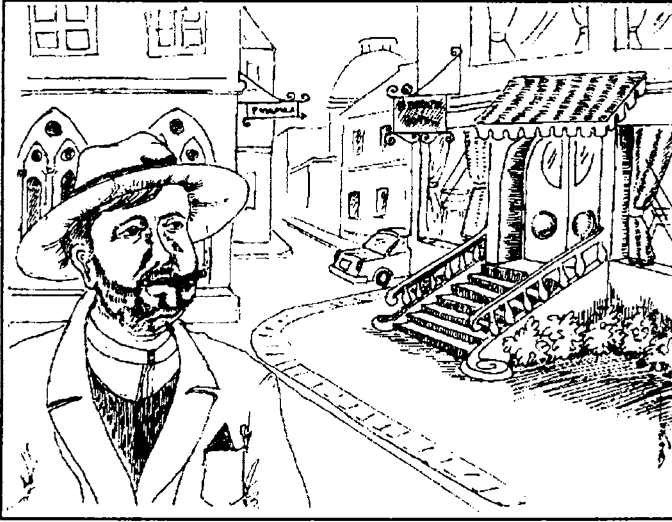
কিন্তু জাহাজে তাঁর সহযাত্রীদের মধ্যে সে রকম লোক কেউ ছিল না, আপাতত: ট্রেনেতেও নেই। হারউচের ট্রেনে তাঁর সঙ্গী মাত্র, জনা ছয়েক লোক — একটি খর্বকায় রেল কর্মচারী, চলেছেন টার্মিনাসের দিকে। জনাকয়েক অল্প খর্বকায় চেহারার সব্জী বিক্রেতা। চলেছে দু স্টেশন পর অবধি। একটি অত্যন্ত খর্বকায় বিধবা মহিলা-চলেছেন এসেক্সের কোন মফস্বলের দিকে। এবং একটি ততোধিক খর্বকায় ক্যাথলিক পাদ্রী, আসছে এসেক্সের কোন মফস্বল থেকে।

হাস্যোদ্দীপক চেহারা এই শেষোক্ত ব্যক্তিটির। আকৃতি প্রকৃতি একেবারে পূবের সমভূমির লোকের মত। ময়দার তালের মত ভাবলেশহীন গোলাকার মুখমণ্ডল, দুচোখে উত্তর সমুদ্রের শূন্যতা। সঙ্গে গোটাকতক ব্রাউন পেপারের পার্শেল যা বারবার পড়ছে ছড়িয়ে। খ্রীষ্টিয় সম্মেলনের টানেই বুঝিবা এসব প্রায়ান্ধ অসহায় জীবের দল বেরিয়ে পড়েছে তাদের অচলায়তনের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে। ভ্যালেন্টিন গোঁড়া ফরাসী নাস্তিক, পাদ্রীদের প্রতি মনে তাঁর কোন ভালবাসা নেই। কিন্তু এই গোবেচারা লোকটির হাবভাব এমন যে তবু মনে দয়া হয়। হাতের জীর্ন ছাতাটা বারবার লুটোচ্ছে মাটিতে, রিটার্ন টিকিটটার সোজা উল্টো বারবার গুলিয়ে ফেলছে, আর সরলভাবে কামরাশুদ্ধু লোককে বলে বেড়াচ্ছে যে তার প্যাকেটে নীল পাথর বসানো একটা রূপোর দামী জিনিষ আছে।

লোকটির নিরীহ নিপাট সরল ব্যবহারে কৌতুক অনুভব করছিলেন ভ্যালেন্টিন। তাই স্ট্র্যাটফোর্ডে নামার সময়ে যখন ছাতাটা ভুলে ফেলে গিয়ে আবার নিতে এলো সে, তাকে খোশমেজাজে সাবধানই করে ফেললেন তিনি, অত ঢাক পিটিয়ে সবাইকে সঙ্গের দামী জিনিষের কথা না বলার জন্য। তবে কথা যাই বলুন, ভ্যালেন্টিনের চোখ কিন্তু সর্বদাই খোলা। ধনী, দরিদ্র পুরুষ নারী নির্বিশেষে, ছ ফুটের ওপর উঁচু মানুষের সন্ধানে দৃষ্টি সদাই সতর্ক।

তাঁর চোখে কিছু ফাঁকি পড়েনি এই ভেবে নিশ্চিন্ত মনেই লিভারপুল স্টেশনে নামলেন ভ্যালেন্টিন। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে গোটাকতক দরকারি কাজ সেরে একটা সিগারেট ধরিয়ে বেরিয়ে পড়লেন লণ্ডনের রাস্তায়।

ভিক্টোরিয়া ছাড়িয়ে এ রাস্তা সে রাস্তা হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎই একটা চৌমাথায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন ভ্যালেন্টিন। লণ্ডনের আদি অকৃত্রিম চৌমাথা - নিঝুম, নিস্তব্ধ শান্তি সেখানে। চারপাশের ঋজু উঁচু বাড়িগুলো স্বচ্ছল অথচ কেমন যেন জনহীন। মাঝখানে তার প্যাসিফিক সমুদ্রে নির্জন দ্বীপের মত এক চিলতে সবুজ কেয়ারির বাগান। চৌমাথার একটা দিক একটু উঁচু — যেন ডায়াসের মত। আর সেইদিকে বাড়ির সারির ফাঁকে পথভোলা অচিন পথিকের মত দাঁড়িয়ে সুন্দর এক নয়নাভিরাম রেস্তোঁরা। বেঁটে বাহারী গাছ আর হলদে সাদা পর্দা দিয়ে সাজানো চোখজুড়ানো চেহারা তার। রাস্তার বুক থেকে একটা উঁচু সিঁড়ি সটান উঠে গেছে তার দরজা অবধি যেমনটি দেখতে পাওয়া যায় শুধু লণ্ডনেই। ওই হলুদ সাদা ডুরে পর্দায় মনে আটকে গেল ভ্যালেন্টিনের। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে থাকলেন তিনি।



ওই হলুদ সাদা ডুরে পর্দায় মনে আটকে গেল ভ্যালেন্টিনের। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে থাকলেন তিনি।

অপ্রত্যাশিত ঘটনারা অপ্রত্যাশিতই, কিন্তু কেন জানি না তবু তার ঘটে। কখনো দেখা যায় আকাশের ছেঁড়া মেঘের দল জোড়া লেগে, চোখের চেহারা নিয়ে তাকিয়ে আছে অনিমেষে। কোন অজানা যাত্রায় অচেনা পথের ধারে কোন একটা গাছকে হয়তবা দেখায় ঠিক যেন প্রশ্নচিহ্নের মত। জয়ের ঠিক আগের মুহূর্তটিতেই মৃত্যু বরণ করেন নৌসেনাপতি নেলসন। দেখা যায় উইলিয়ামসন যার হাতে খুন হয়েছে আকস্মিকভাবেই, তার নাম উইলিয়াম। অল্প কথায় বলতে গেলে, যুক্তিবাদীদের চোখে না পড়লেও কোন এক অপদেবতার অঙ্গুলীহেলনে কাকতালীয় ঘটনা, আমাদের জীবনে ঘটতেই থাকে। তাই বোধহয় তাঁর রচনায় পো বলেছেন যে বুদ্ধিমান মানুষের সর্বদাই উচিত অপ্রত্যাশিতের প্রত্যাশা করা।

অ্যারিস্টিড ভ্যালেন্টিন কট্টর ফরাসী। নিখাদ ফরাসী মেধা তাঁর। যান্ত্রিকতার কোন ছাপ নেই সেখানে। মন তাঁর একাধারে চিন্তাশীল এবং ঋজু। সাধারণ বুদ্ধির জোরে আর যুক্তির সোপান বেয়েই ভ্যালেন্টিন পেয়েছেন তাঁর যত অসামান্য সাফল্য। যুক্তির মূল্য বোঝেন বলেই তাই ভ্যালেন্টিন যুক্তির সীমারেখাও জানেন। মটর গাড়ি চলতে যেমন প্রয়োজন পেট্রলের তেমনি যুক্তির সোপান দাঁড় করাতে প্রয়োজন একটা ভিত্তির। ফ্ল্যাম্বো রহস্য সমাধানে যুক্তিপ্রয়োগের কোন ভিত্তি

আপাততঃ ভ্যালেন্টিনের কাছে নেই। যেভাবেই হোক হারউইচে সে এড়িয়েছে নজর। লণ্ডনের উম্বলডন মাঠের ভিখিরী, না মেট্রোপোল হোটেলের বেয়ারা, কি ছদ্মবেশে সে আছে লুকিয়ে, তাও আন্দাজ করা মুস্কিল।

এহেন প্রতিকূল অবস্থার জন্য ভ্যালেন্টিনের আছে অন্য পদ্ধতি। খোঁজ করেন তিনি অপ্রত্যাশিতের। যুক্তি যেখানে অচল, সেখানে তিনি ধরেন অন্যপথ। ব্যাঙ্কে, থানায় আড্ডাখানায় খোঁজ না করে তিনি কড়া নাড়েন খালি বাড়ির, ঘুরে বেড়ান অলিতে গলিতে, হানা দেন আবর্জনার গাদায়। মনে আশা আকস্মিক কোন কিছুতে যদি তাঁর নজর আটকে যায়, তাহলে তাঁর শিকারও হয়ত তারই টানে থমকে দাঁড়িয়ে থেকে থাকবে। তাঁর শিকারের অনুসরণ শুরু করার জন্যে সেটাই হয়ত তাই শ্রেষ্ঠ জায়গা।

ওই ধাপে ধাপে ওঠা সিঁড়ি আর রেস্তোঁরার নির্জন সাবেকিয়ানা কেমন জানি বিরল এক কল্পনার রঙ নিয়ে এল ভ্যালেন্টিনের মনে। তিনি ঠিক করলেন এখান থেকেই তিনি তাঁর কাজ শুরু করবেন।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে জানলার ধারে একটা টেবিলে বসে অর্ডার দিলেন তিনি ব্ল্যাক কফির। সকাল গড়িয়ে বেলা বাড়ছে, টেবিলের ওপর পড়ে আগের খদ্দেরদের খাবারের অল্প কিছু গুঁড়ো ভুক্তাবশেষ। সে দেখে মনে পড়ল ভ্যালেন্টিনের যে সকাল থেকে তাঁর ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়নি। একটা ডিমের পোচের অর্ডার দিয়ে কফিতে চিনি গুলতে লাগলেন তিনি। মন কিন্তু পড়ে ফ্ল্যাম্বোর ওপরেই। ভাবতে লাগলেন কেমন করে অতীতে ফ্ল্যাম্বো পালিয়েছে তাঁর নাগাল ফেলেই, কখনো নখ কাটা কাঁচির সাহায্যে, কখনো বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে, কখনো বেয়ারিং পোস্টের পয়সা দিয়ে। আর একবার তো লোককে পৃথিবী ধ্বংসের গল্প শুনিয়ে তাদের চোখে টেলিস্কোপ লাগিয়ে দিয়ে। গোয়েন্দার বুদ্ধি কোন অংশেই ন্যূন না হলেও অপরাধীর একটা মস্ত বড় সুবিধে আছে। কারণ অপরাধীর ভূমিকা শিল্পীর, আর গোয়েন্দার ভূমিকা সমালোচকের।

এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতেই, একচুমুক কফি খেয়েই কাপটা ঠকাস করে নামিয়ে রাখলেন তিনি — চিনির বদলে কফিতে নুন ঢেলেছেন তিনি। ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন ভ্যালেন্টিন চিনির বাটিটার দিকে — যেখান থেকে চিনি ভেবে সাদাগুঁড়োটা কাপে ঢেলেছেন তিনি। সাধারণ চিনির বাটি, যেমনটি হয়ে থাকে তেমনই। কিন্তু তবে এতে চিনির বদলে নুন কেন? নজর গেল তাঁর টেবিলে রাখা একজোড়া নুনদানির দিকে। আচ্ছা, এ দুটোতেও উল্টোপাল্টা কিছু

নেই তো? চেখে দেখলেন তিনি — চিনি! নতুন আগ্রহে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন ভ্যালেন্টিন। কে সেই শিল্পী যে নুন আর চিনি উল্টোপাল্টা করে রেখে যায়? আর কোন চিহ্ন রেখে গেছে কি সে? কিন্তু আর কিছু দেখতে পেলেন না। সাদা দেওয়ালে বাদামী রঙের ভিজে কিছুর গড়িয়ে পড়ার দাগ ছাড়া, সমস্ত জায়গাটাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সাদামাটা।

ঘন্টা বাজিয়ে বেয়ারাকে ডাকলেন তিনি। উস্কোখুস্কো চুল আর ঘুমজড়ানো চোখ নিয়ে হাজির হল বেয়ারা। ভ্যালেন্টিনের মনে রসবোধের অভাব নেই, অন্য কিছু না বলে চিনির বাটিটা থেকে বেয়ারাকে একটু চেখে দেখতে বললেন। ফল হল আশাতীত — এক ঝটকাতেই ঘুম ভেঙে গেল তার।

— সকাল সকাল খদ্দেরদের সঙ্গে তোমরা এইরকমই পরিহাস করে থাকো নাকি? জিজ্ঞেস করলেন ভ্যালেন্টিন - চিনি আর নুনদানি উল্টোপাল্টা করে দিয়ে তোমরা কি মজা দেখছ?

আমতা আমতা করে বেয়ারা বোঝানোর চেষ্টা করতে লাগল যে কাজটা তারা ইচ্ছে করে করেনি, হয়ত ভুলবশত: হয়ে গিয়ে থাকবে। তারপর হতভম্বের মত এক একবার চিনি আর নুনদানিটা দেখতে থাকল তুলে তুলে। শেষকালে থাকতে না পেরে ছুটে গিয়ে ধরেই আনল রেস্তোঁরার মালিককে।

চিনি আর নুনদানি পরীক্ষা করে মালিকও দাঁড়িয়ে রইল হতভম্বের মত। কিন্তু হঠাৎই কি মনে পড়ে তাড়াতাড়ি কথা বলতে গিয়ে কথা জড়িয়ে এল বেয়ারার — এটা হচ্ছে ...... মনে হচ্ছে ...... এটা দুই পাদ্রীরই কাজ।

— দুই পাদ্রী?

— হ্যাঁ, ওই দুই পাদ্রী, যারা দেওয়ালে সূপ ছুঁড়ে মেরেছিল।

— দেওয়ালে সূপ ছুঁড়ে মেরেছিল! বিস্ময়ে পুনরুক্তি করলেন ভ্যালেন্টিন।

ছুটফটিয়ে দেওয়ালের বাদামী দাগটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল বেয়ারা।

— হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই যে, ওই দেওয়ালে!

প্রশ্নের ভঙ্গীতে ভ্যালেন্টিন তাকালেন মালিকের দিকে। সমস্ত গল্পটা শোনা গেল তারই মুখে।

— হ্যাঁ হুজুর, কথাটা সত্যি। অবশ্য এর সঙ্গে নুন আর চিনির ব্যাপারের কোন সম্পর্ক আছে কিনা জানি না। সাতসকালে দোকান খোলার সাথে সাথেই দুই পাদ্রী এসে বসে সূপের ফরমায়েশ দিলেন। নিরীহ ভদ্রলোকের মত চেহারা দুজনেরই। দুজনের মধ্যে একজন বিল মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। অন্যজন খানিকটা হাবাগোবা ধরনের। নিজের ছড়ানো জিনিষপত্র গুছিয়ে বেরোতে তার মিনিটখানেক সময় বেশী লাগল। আর বেরোনের ঠিক আগে সূপের বাটি থেকে পড়ে থাকা বাকি সূপটা দেওয়ালে ছুঁড়ে মেরে দিয়ে বেরিয়ে গেল সে। আমরা তখন দুজনে পেছনের ঘরে। ছুটে বেরিয়ে এসে দেখি দেওয়াল দিয়ে সূপ গড়াচ্ছে। আমার ক্ষতি বড় একটা কিছু হয়নি, কিন্তু আস্পদ্দাটা বুঝুন একেবারে। রাস্তায় ছুটে দুজনকে ধরতে গেলাম। কিন্তু তারা তখন অনেকদুর চলে গেছে। শুধু দেখতে পেলাম তারা মোড় ঘুরে কার্সটেয়ার স্ট্রীটের দিকে চলে গেল।

টুপি মাথায় দিয়ে ছড়ি হাতে লাফিয়ে উঠলেন গোয়েন্দাপ্রবর। অন্ধকারের মধ্যে এ অদ্ভুত, অপ্রত্যাশিত ঘটনাটা আলোর ছটার মতনই মনে হল তাঁর — এর দিকেই আপাততঃ দৌড়বেন তিনি এখন। বিল চুকিয়ে দিয়ে ঝড়ের মত দরজাটা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন তিনি। দৌড়লেন মোড় ঘুরে অন্য রাস্তাটার দিকে।

এ চরম উত্তেজনার মুহূর্তেও ভ্যালেন্টিনের চোখ কিন্তু সদা সজাগ। তাই একটা দোকানের সামনে দিয়ে ছুটে যাবার সময় কি একটা চোখে পড়াতে আবার পেছনে হেঁটে ফিরে এলেন তিনি জিনিষটা ভাল করে দেখার জন্য।

ফল আর শাকসব্জীর দোকান, দোকানের সামনে গাদা করে রাখা ফল আর সব্জী, তাদের গায়ে নাম আর দামের টিকিট। এদের মধ্যে দুটো গাদা কমলালেবুর আর বাদামের। বাদামের গাদার ওপর একটুকরো কার্ডবোর্ড, তাতে নীল খড়ি দিয়ে লেখা 'ট্যাঞ্জেরিন কমলালেবু — এক পেনি জোড়া'। তেমনি কমলালেবুর গাদাটার ওপর কার্ডবোর্ডে লেখা, 'ব্রেজিলের বাদাম - চার শিলিঙে পাউণ্ড'। এ ধরনের সূক্ষ্ম রসিকতা খানিক আগেই দেখে এসেছেন ভ্যালেন্টিন, তাই দোকানিকে ডেকে দেখালেন তার বিজ্ঞাপনের এহেন ত্রুটি। সে তখন বেশ গরম মেজাজেই রাস্তার সামনে পেছনে তাকাচ্ছে, কথা না বলে স্রেফ কার্ডদুটো ঠকাস ঠকাস করে পাল্টে সঠিক জায়গায় বসিয়ে দিল।



ভ্যালেন্টিন বেশ কায়দা করে ছড়িতে ভর দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন দোকানখানা।

ভ্যালেন্টিন বেশ কায়দা করে ছড়িতে ভর দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন দোকানখানা। তারপর খানিকক্ষন বাদে বললেন,

— আমার অহেতুক কৌতূহল মাপ করবেন মশাই। কিন্তু আপনাকে পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্ব এবং ভাবের মেলবন্ধন সম্বন্ধে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি কি?

উত্তরে লালমুখো দোকানি শুধু রক্তচক্ষুতে তাকাল ভ্যালেন্টিনের দিকে। গ্রাহ্য করলেন না ভ্যালেন্টিন, বেশ খোশমেজাজেই ছড়ি দোলাতে দোলাতে বললেন,

— সব্জীর দোকানে দামের টিকিট পাল্টে যাবার রহস্যটা কি বলতে পারেন? ওর পেছনে আছে কি কোন অতিন্দ্রীয় ঘটনা যার মূলে দুই পাদ্রী।

রাগে দুচোখ প্রায় ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল দোকানির। মনে হল এই বুঝে সে ঝাঁপিয়েই পড়ে ভ্যালেন্টিনের ওপর। তবে তা না করে শুধু রাগে একরকম তোতলাতে তোতলাতে বলল,

— আপনার তাদের সঙ্গে কি সম্বন্ধ আছে জানি না। কিন্তু আপনি যদি

তাদের বন্ধু বান্ধব কেউ হোন, তাহলে তাদের বলে দেবেন যে ফের যদি তারা আমার আপেল উল্টে দেয় তাহলে আমি তাদের মেরে পস্তা উড়িয়ে দেব। তা তারা পাদ্রীই হোক আর যাই হোক।

— তাই নাকি? বেশ সহানুভূতির সুরেই বললেন গোয়েন্দাপ্রবর — আপনার আপেল উল্টে দিয়েছিল নাকি তারা?

বেশ গরম হয়েই দোকানি বলল,

— হ্যাঁ ও দুজনের একজন আমার সব আপেল রাস্তাময় ছড়িয়ে দিয়ে গেছে। নেহাৎ আমায় আপেলগুলো কুড়োতে হল, না হলে ধরতাম ব্যাটাকে।

— তা কোন দিকে গেলেন, সে পাদ্রীমশাইরা? প্রশ্ন করলেন ভ্যালেন্টিন।

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল দোকানি, — ওই বাঁদিকে দ্বিতীয় রাস্তাটা ধরে তারপর চৌমাথাটা পার হয়ে গেছে।

— ধন্যবাদ বলে মুহুর্তের মধ্যেই সেখান থেকে প্রস্থান করলেন ভ্যালেন্টিন।

চৌমাথার অন্যপাশে একজন পুলিশকে জিজ্ঞেস করলেন, — অত্যন্ত জরুরী ব্যাপার কনস্টেবল। দুজন পাদ্রীকে দেখেছ নাকি? জোরে জোরে হাসতে আরম্ভ করল পুলিশটি,

— দেখেছি বই কি হুজুর। তারমধ্যে একজন বোধহয় খানিকটা মাতালও ছিল। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে এমন হতভম্বের মত —

— কোন দিকে গেল তারা? বাধা দিলেন ভ্যালেন্টিন।

— হ্যাম্পস্টেড যাবার ওইরকম একটা হলদে রঙের বাসে চড়ে চলে গেল।

ভ্যালেন্টিন কার্ডখানা দেখিয়ে ঝটপট বললেন,

— তোমার দুজন লোককে বলো আমার সঙ্গে ওদের পেছনে ধাওয়া করতে হবে।

রাস্তা পার হয়ে গেলেন ভ্যালেন্টিন এমন উৎসাহে যে তা দেখে সে ঢিলেঢালা পুলিশটিও তৎপর হয়ে পড়ল তাঁর নির্দেশ পালনে। মিনিট খানেকের

মধ্যেই ফরাসী গোয়েন্দার সঙ্গে যোগ দিল একজন ইন্সপেক্টর এবং একজন সাদা পোষাকের পুলিশ। বেশ বড়দরের মানুষের মত হেসে প্রথমজন বলল।

— হ্যাঁ স্যার। এবার বলুন আমরা কি —

ছড়ি উঁচিয়ে দেখালেন ভ্যালেন্টিন। বললেন,

— ওই বাসটায় চড়ে সব বলব আপনাদের তারপরেই সাথে সাথে গাড়িঘোড়া বাঁচিয়ে দৌড় লাগালেন যানজটের মধ্যে দিয়ে।

হাঁপাতে হাঁপাতে তিনজন যখন হলুদ বাসের ওপরের একখানা সীটে শেষ পর্যন্ত বসলেন। ইন্সপেক্টরটি তখন বললেন,

— ট্যাক্সিতে করে গেলে এর চারগুণ তাড়াতাড়ি হত।

ঠিকই - শান্তকণ্ঠে বললেন ভ্যালেন্টিন — যদি আমরা আগে থেকে জানতাম যে আমাদের কোথায় যেতে হবে।

অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে অন্যজন প্রশ্ন করল,

— কিন্তু যাচ্ছি কোথায় আমরা?

ভ্রু কুঁচকে খানিকক্ষন সিগারেট টানলেন ভ্যালেন্টিন। তারপর সেটা মুখ থেকে সরিয়ে বললেন, — কেউ কি করবে যদি আগে থেকে জানা থাকে তাহলে তার সামনে যাওয়া যায়। কিন্তু সে কি করতে চলেছে তা যদি আন্দাজ করতে হয় তাহলে চলতে হয় তার পিছু পিছু। সে পথ হারালে হারাতে হয় পথ। সে থামলে হয় থামতে। চলতে হয় তারই মতন মন্থর গতিতে। তবেই হয়ত সে যা দেখেছে তা পড়তে পারে আমার নজরে। আমরাও করতে পারি সে যা করেছে। আমাদের করণীয় অদ্ভুত কোন কিছুর জন্যে শুধু চোখ খোলা রাখা।

— কি অদ্ভুত ব্যাপারের কথা বোঝাতে চাইছেন? প্রশ্ন করল ইন্সপেক্টর।

— যে কোন অদ্ভুত ব্যাপার। বলে মুখে কুলুপ আঁটলেন ভ্যালেন্টিন।

উত্তরের রাস্তা ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল হলুদে বাসখানা। কিন্তু কোনরকম কৈফেয়ৎ দেবার প্রয়োজন বোধ করলেন না গোয়েন্দ্রপ্রবর। তাঁর শাগরেদরা তাঁর এই কাজের ব্যাপারে ধীরে ধীরে সন্দিহান হয়ে পড়তে লাগল। তাছাড়া দুপুরের খাবার সময় অনেকক্ষন পার হয়ে যাওয়াতে ক্ষুধার্তও তারা।

অন্তহীনভাবে ছড়িয়ে রয়েছে উত্তর লণ্ডনের রাস্তা। মাঝে মধ্যেই মনে হচ্ছে কিছু হতশ্রী সরাইখানা আর বিষাদাচ্ছন্ন ঝোপঝাড়ের শেষ হাতছানি দিয়ে লণ্ডনের সীমানা বুঝি বা শেষ হয়ে গেল। তারপরেই আবার হঠাৎ করে আর্বিভাব হচ্ছে ঝলমলে রাস্তা আর জমকালো সব হোটেলের। মনে হল বুঝি তাঁরা পার হয়ে এলেন তেরোখানা আলাদা আলাদা শহর।

ক্রমশ শীতের সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে আরম্ভ করল রাস্তার ওপর। কিন্তু তবু প্যারিসের গোয়েন্দামশাই শুধু নীরবে নজর করতে থাকলেন রাস্তার দুপাশ। ক্যামডেন শহর যখন তাঁরা পেছনে ফেলে এগিয়ে গেলেন তখন দুই পুলিশকর্মী প্রায় পড়েছে ঘুমিয়ে। ভ্যালেন্টিন ড্রাইভারকে চেঁচিয়ে থামতে বলে সে দুজনের কাঁধে হাত দিয়ে ডাকতে চমকে উঠল তারা। কি করতে চলেছে তারা না বুঝেই হুড়মুড়িয়ে নেমে এল সিঁড়ি দিয়ে। উত্তরের আশায় চারপাশে চাইতে নজরে পড়ল ভ্যালেন্টিন রাস্তার বাঁ পাশে একটা জানলার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বিজয়ীর ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছেন।

একখানা জমকালো হোটেলের সম্মুখভাগের জানলা। হোটেলের যে অংশটি বড়মানুষদের খাওয়াদাওয়ার জায়গা, সেইখানটিতেই লাগানো বিরাট জানলাটি, ওপরে লেখা 'রেস্তোঁরা'। হোটেলের সমস্ত সম্মুখভাগটির মত এ জানলাটিও তৈরী চিত্রবিচিত্র ঝাপসা কাঁচে — তার মাঝখানে খানিকটা অংশ ভেঙে উধাও, যেন বরফে আঁকা তারার ছবি।

ছড়ি নাচাতে নাচাতে ভ্যালেন্টিন বললেন,

— অবশেষে পাওয়া গেছে সূত্র — ওই ভাঙা জানলাখানা।

— কোন জানলা? কি সূত্র? প্রশ্ন করল তাঁর সহকারীটি — এটার সঙ্গে ওদের যে কোন সম্পর্ক আছে তার প্রমাণ কি?

রাগের চোটে ভ্যালেন্টিন বাঁশের ছড়িখানা প্রায় ভেঙেই ফেলছিলেন। চেঁচিয়ে বললেন,

— প্রমাণ? এযে দেখছি প্রমাণ চাইছে! এটার সাথে ওদের কিছু সম্পর্ক থাকার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। কিন্তু আমাদের আর কিই বা করার আছে? হয় এ ধরনের বিচিত্র অপ্রাসঙ্গিক ঘটনার পেছনে দৌড়নো কিম্বা বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়া ছাড়া আমাদের কাছে আর কোন রাস্তা নেই।

পেছনে দুই শাগরেদ নিয়ে ভ্যালেন্টিন দড়াম করে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লেন রেস্তোঁরায়। ভাঙা জানলার কাছে একটা ছোট টেবিলে খেতে বসে পড়লেন তিনজনে। অবশ্য সে ভাঙা কাঁচখানা ভেতর থেকে দেখেও বোঝা গেল না কিছুই।

বিলের পয়সা মেটাতে মেটাতে ভ্যালেন্টিন বেয়ারাকে বললেন,

— তোমার কাঁচখানা ভেঙে গেছে দেখছি যে!

— হ্যাঁ হুজুর - উত্তর দিল বেয়ারা। সে তখন ঝুঁকে পড়ে পয়সা গুনতে ব্যস্ত - তার সাথে ভ্যালেন্টিন জুড়ে দিয়েছিলেন মোটা বখশিষ।

সিধে হয়ে দাঁড়াল বেয়ারা, চেহারায় তার হাল্কা উত্তেজনার ছাপ। বলল,

— হ্যাঁ হুজুর। অদ্ভুত ব্যাপার হুজুর!

উদাসীন কৌতূহলের স্বরে ভ্যালেন্টিন বললেন,

— তাই নাকি? বলতো দেখি কি হয়েছিল।

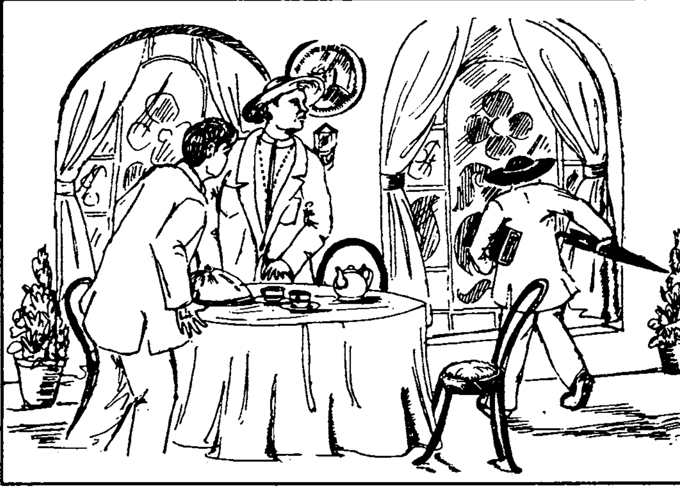
— আজকাল ওইসব বিদেশী পাদ্রীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে না? তাদেরই মধ্যে কালো পোষাকে দুজনে এসেছিল। দুজনে সস্তা দামের লাঞ্চ খেল। তারপর তাদের মধ্যে একজন দাম মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। অন্যজন সবে বেরোচ্ছে আমি পয়সা গুনতে গিয়ে দেখি প্রায় তিনগুণ বেশী পয়সা দিয়ে ফেলেছে। যে জন দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে প্রায়, আমি তাকে বললাম, এই যে মশাই, আপনি অনেক বেশী পয়সা দিয়েছেন। সে বেশ নিরুত্তাপ গলায় আমায় বলল 'ও তাই নাকি?' আমি বললাম 'হ্যাঁ', তারপরে তাকে বিলখানা দেখাতে গিয়ে একেবারে ঝটকা খেলাম।

— কি বলতে চাইছ? প্রশ্ন করলেন ভ্যালেন্টিন।

— আমি হলফ করে বলতে পারি আমি বিলে ৪ শিলিং লিখেছিলাম। কিন্তু তখন দেখি বিলে রয়েছে ১৪ শিলিং।

— তারপর? তারপর কি হল? প্রশ্ন করলেন ভ্যালেন্টিন। শরীর নিষ্কম্প তাঁর, কিন্তু জ্বলছে দুই চক্ষু।

— দরজার কাছে দাঁড়ানো পাদ্রীটি বলল, 'তোমার হিসেব উল্টোপাল্টা



ছাতা দিয়ে জানলাটা ভেঙে দিল।

করে দেবার জন্য দুঃখিত। তবে ওতে তোমার জানলার দাম উঠে যাবে'। আমি জিজ্ঞেস করলাম 'কোন জানলা?' সে বলল 'যে জানলাখানা আমি এবার ভাঙব', বলে ছাতা দিয়ে জানলাটা ভেঙে দিল।

বিস্ময়ের শব্দ করলেন তিন আইনরক্ষকই। ইন্সপেক্টরটি বলল,

— আমরা গারদ ভাঙা কোন পাগলের পেছনে ধাওয়া করছি নাকি?

বেয়ারা বলে চলল তার সেই বিচিত্র কাহিনী,

— কয়েক মুহূর্তের জন্য আমি এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম যে কিচ্ছু করতে পারিনি। পাদ্রীটি হনহনিয়ে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তার কোনে দাঁড়ানো তার সঙ্গীর সাথে যোগ দিল। তারপর বুলক স্ট্রীট ধরে দুজনে এত তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল যে আমি তাদের ধরতেই পারলাম না।

— বুলক স্ট্রীট - বলে ভ্যালেন্টিন দৌড় দিলেন রাস্তা ধরে।

যাত্রাপথ তাঁদের সুড়ঙ্গের মত ইঁট বাঁধানো নিরাভরণ রাস্তা ধরে। সে রাস্তায় বাতি অল্পই, জানলা আরো কম। যেন রাস্তার দুপাশেই কেবল বাড়ির রিক্ত পশ্চাদভাগ। ঘনিয়ে আসছে সন্ধ্যা, আর দিগবিদিক গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে

খোদ লণ্ডনের পুলিশকর্মীদেরও, যদিও ইন্সপেক্টরটি মোটামুটি নিশ্চিত যে এ রাস্তা ধরে তাঁরা অবশেষে গিয়ে পৌঁছবেন হ্যাম্পস্টেডের মাঠে।

হঠাৎই সেই নীল সন্ধ্যালোকে চোখে পড়ল গ্যাসের আলোয় উজ্জ্বল লণ্ঠনের মত উঁচু একখানা জানলা। ভ্যালেন্টিন দেখলেন ছোট্ট একখানা ঝলমলে মিষ্টির দোকান। এক মুহূর্ত ইতস্তত: করে ভেতরে ঢুকে পড়লেন তিনি - রঙবেরঙের মিষ্টির মাঝখানে গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে বাছাই করে কিনে ফেললেন তেরোখানা চকলেটের সিগার। তিনি বোধকরি সূত্রপাত করার একটা সুযোগ খুঁজছিলেন, কিন্তু তার আর দরকার হল না।

দোকানের কৃশাঙ্গী প্রৌঢ় মহিলাটি এতক্ষন এই কেতাদুরস্ত আগন্তুকটিকে শুধু কৌতূহলের সাথেই লক্ষ্য করছিলেন। কিন্তু দরজায় ইন্সপেক্টরের নীল উর্দীর আবির্ভাব হতেই সহসা জাগ্রত হয়ে উঠল তাঁর দুই চক্ষু। তিনি বললেন, — ও আপনারা ওই পার্শেল নিতে এসেছেন বুঝি? আমি তো সেটা ইতিমধ্যেই পাঠিয়ে দিয়েছি।

— পার্শেল? প্রশ্ন করলেন ভ্যালেন্টিন। কৌতূহল এবার তাঁর চোখে।

— মানে যে পার্শেলখানা ওই পাদ্রী ভদ্রলোক ফেলে গেছিলেন।

অধীর আগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন ভ্যালেন্টিন। বললেন,

— দয়া করে খুলে বলুন দিকি কি হয়েছিল?

সংশয়ের ছোঁয়া লাগল মহিলাটির কণ্ঠস্বরে। বললেন,

— আধঘন্টা আগে দুই পাদ্রী এসে পিপারমিন্ট কিনলেন। খানিক গল্পগাছা করলেন, তারপর চলে গেলেন মাঠের দিকে। কিন্তু এক মুহূর্তবাদেই তাদের একজন দৌড়ে ফেরৎ এসে বললেন

— 'আমি কি একটা পার্শেল ফেলে গেছি?'। আমি সব জায়গায় খুঁজলাম, কিন্তু কিছু পেলাম না। তিনি তখন বললেন, 'যাকগে। পরে যদি কখনো খুঁজে পান তাহলে এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন। বলে আমায় একটা ঠিকানা আর একটা শিলিং দিয়ে চলে গেলেন। তাপর আমি দেখি সত্যিই উনি একটা ব্রাউন পেপারে মোড়া পার্শেল ফেলে গেছেন। সেটা আমি ডাকে দিয়ে দিয়েছি। ঠিকানাটা অবশ্য ঠিক মনে নেই — ওয়েস্টমিনিস্টারের কোথাও একটা হবে। তা আমি

ভাবলাম জিনিষটা বোধহয় খুব দরকারি, তাই এখন পুলিশ এসেছে।

— হ্যাঁ তাই এসেছে - সংক্ষেপে বললেন ভ্যালেন্টিন — হ্যাম্পস্টেডের মাঠ এখানে কাছাকাছি নাকি?

— সিধে পনেরো মিনিট হেঁটে গেলে খোলা জায়গায় গিয়ে পড়বেন। বললেন মহিলা।

একলাফে দোকান থেকে বেরিয়ে দৌড় দিলেন ভ্যালেন্টিন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও পেছনে হনহনিয়ে হাঁটতে লাগল বাকি দুই পুলিশকর্মী।

তাঁদের পথের রাস্তাটি এমনই সরু আর ছায়ান্ধকার যে হঠাৎই যখন তাঁরা খোলা মাঠে বিশাল আকাশের নিচে এসে পড়লেন, আশ্চর্য হয়ে দেখলেন সন্ধ্যার পরিস্কার আকাশে তখনো রয়েছে আলো — আকাশের ময়ূরপঙ্খী চন্দ্রাতপ সোনালী সীমানা টেনে মিশেছে মসীবর্ণ' দিগন্তে। আকাশের উজ্জ্বল গাঢ় হরিদ্বর্ণে' হীরক স্ফুলিঙ্গের মত দু একটা তারা। দিনের শেষ আলোটুকু সোনালী ফিতের মত ছড়িয়ে আছে মাঠের শেষপ্রান্তে আর মাঠের মাঝখানের উপত্যকার মত জায়গাটুকুতে। বেড়াতে আসা লোকজনেরা তখনও ফেরৎ যায়নি সবাই। মাঝে মধ্যে চোখে পড়ে বেঞ্চিতে নিবিড়ভাবে বসা দু একটি দম্পতি, বা কানে আসে দোলনায় বসা বালিকার আনন্দের উচ্চরব। আকাশের ঐশ্বরিক সৌন্দর্য মানুষের মামুলি দুনিয়ার চারধারে পরিণত হচ্ছে ক্রমঘনায়মান অন্ধকারে, কিন্তু তবু উঁচু ঢালু জমিতে দাঁড়িয়ে ভ্যালেন্টিন দর্শন পেলেন তাঁর বাঞ্ছিত ব্যক্তিদের।

দুরের ছায়ামূর্তির মত মানুষের দলগুলি ছড়িয়ে যাচ্ছে এদিকে সেদিকে, কেবল পাদ্রীর পোষাক পরা দুটি মানুষ রয়েছে একসঙ্গে। দুর থেকে তাদের পিঁপড়ের মত লাগলেও, ভ্যালেন্টিন লক্ষ্য করলেন, যে তাদের একজন দীর্ঘাঙ্গ আর অন্যজন খর্বকায়। ঈষৎ ঝুঁকে চলেছে শেযোক্ত ব্যক্তি, দেহভঙ্গীতে তার কোন বৈশিষ্ট নেই। কিন্তু প্রথম ব্যক্তি ছ ফুটের ওপর লম্বা। দাঁতে দাঁত চেপে অধৈর্য্যভাবে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে ভ্যালেন্টিন এগিয়ে গেলেন সামনে। খানিকবাদে যখন কমে এল তাঁর আর দুই কৃষ্ণমূর্তির মাঝের দূরত্ব, কাছ থেকে যখন দেখা গেল তাদের আকার, বিস্ময়ের সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করলেন আরো একটি ব্যাপার — যার সম্ভাবনা কখনো কখনো ঈষৎ নাড়া দিচ্ছিল তার মনের কোনে। দীর্ঘাঙ্গ পাদ্রীটি যেই হোন না কেন, খর্বকায় পাদ্রীটির সম্বন্ধে সন্দেহের

কোন অবকাশ নেই। ইনি সেই এসেক্সের বেঁটেখাটো পাদ্রীটি, যাঁর সঙ্গে তাঁর আগেই মোলাকাত হয়েছিল হারউচের ট্রেনে। যাকে তিনি সাবধানও করেছিলেন তাঁর ব্রাউনপেপারের পার্শেলগুলোর সম্বন্ধে।

এ পর্যন্ত তো যুক্তির একখানা কাঠামো খাড়া করা গেল ভালভাবেই। সকালবেলা ভ্যালেন্টিন জানতে পেরেছিলেন যে ফাদার ব্রাউন নামক এসেক্সের একটি পাদ্রী নীলা বসানো রুপোর একটি প্রাচীন ক্রুশ সাথে নিয়ে রওনা দিয়েছেন সম্মেলনের বিদেশী পাদ্রীদের দেখানোর জন্য। তার মানে সকালের ট্রেনে দেখা আনাড়িটিই ফাদার ব্রাউন। আর তিনি যে তাঁর সঙ্গের নীল পাথর বসানো রুপোর জিনিষটার কথা বারেবারেই বলছিলেন নি:সন্দেহে সেটাই সেই ক্রুশ।

অবশ্য ভ্যালেন্টিন যা জানতে পেরেছেন তার খবর যে ফ্ল্যাম্বোও পেয়েছে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই — ফ্ল্যাম্বোর কাজই হল সবকিছুর খবর রাখা। নীলা বসানো একটা ক্রুশের খবর পেলে যে ফ্ল্যাম্বো তা চুরি করার চেষ্টা করবে তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই, — তার পক্ষে সে কাজ অত্যন্ত স্বাভাবিক। ছাতা আর পার্শেলি সমেত হাবাগোবা লোকটাকে যে ফ্ল্যাম্বো বোকা বানাবে তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। লোকটির যেটুকু পরিচয় পাওয়া গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই যে তাকে যে কেউ মাথায় হাত বুলিয়ে অনায়াসে উত্তর মেরু পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে — আর ফ্ল্যাম্বো যে আর একজন পাদ্রী সেজে তাকে হ্যাম্পস্টেডের মাঠ অবধি নিয়ে আসবে তাতে আর আশ্চর্য কি! এ পর্যন্ত তো অপরাধের প্রণালীটি বোঝা যাচ্ছে স্পষ্টভাবেই। অসহায় পাদ্রীটির ওপর ভ্যালেন্টিনের মনে দয়া হলেও এমন একটা আনাড়ি শিকার ধরার জন্য ফ্ল্যাম্বোর ওপর তাঁর খানিক রাগই হচ্ছিল।

কিন্তু যে সব ঘটনাগুলো ভ্যালেন্টিনকে তাঁর লক্ষ্য অবধি পৌঁছে দিয়েছে, তাদের কথা যতই ভাবতে লাগলেন ততই গুলিয়ে যেতে লাগল তাঁর বুদ্ধিশুদ্ধি। সেই সব বিচিত্র ঘটনার কোন কারণ খুঁজে পেলেন না তিনি অনেক ভেবেও। এসেক্সের একটি পাদ্রীর থেকে নীলা বসানো রূপোর ক্রুশ চুরি করার চেষ্টার সাথে দেওয়ালে সূপ ছুঁড়ে মারার সম্পর্ক কোথায়? বাদামের সাথে কমলালেবু উল্টোপাল্টা করে দেওয়ার কিম্বা প্রথমে পয়সা দিয়ে তারপরে জানলা ভাঙার সম্পর্কই বা কোথায়? শিকারের পশ্চাদ্ধাবনের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছে গেছেন তিনি, কিন্তু মাঝখানটা তাঁর কাছে রয়ে গেছে ধোঁয়াটে। এর আগে ভ্যালেন্টিন

যখন অকৃতকার্য হয়েছেন তখন সূত্রের মানে ধরতে পারলেও অপরাধী পালিয়েছে হাত ফস্কে। কিন্তু এখানে অপরাধী তাঁর হাতের মুঠোয় অথচ সূত্রগুলো রয়ে গেছে প্রহেলিকাময়।

সামনের দুই ব্যক্তি তখন একটা উঁচু টিলার গা বেয়ে পিঁপড়ের মতন উঠছে। কথপোকথনে ব্যস্ত দুজনেই তাই হয়ত নজর করছে না তারা চলেছে কোন দিকে। কিন্তু কোন সন্দেহ নেই তারা পাড়ি দিয়েছে মাঠের সবচাইতে নির্জন নীরব এলাকাটির দিকে। তাদের পশ্চাদগামীরা যত তাদের নিকটবর্তী হতে থাকলেন ততই মৃগ শিকারীর মত কখনো ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে আবার কখনো উঁচু ঘাসের মধ্যে শুয়ে পড়ে এগোতে হল তাঁদের। এহেন অমার্জিত দক্ষতার সাথেই কিন্তু তাঁরা ক্রমশ পৌঁছে গেলেন তাঁদের শিকারের কাছাকাছি। অবশেষে শোনা গেল তাদের কথপোকথনের গুঞ্জন। কোন শব্দ পরিষ্কার করে শোনা না



আলোচনায় ব্যস্ত দুই পাদ্রী।

গেলেও উচ্চকণ্ঠে 'যুক্তি' কথাটা শোনা গেল বেশ কয়েকবার।

মাঝে খানিকটা ঢালু জায়গায় ঝোপঝাড়ের মধ্যে গোয়ন্দোরা হারিয়ে ফেললেন তাদের লক্ষ্য দুই মূর্তি কে। তাদের পথচিহ্ন খুঁজে পেতে লাগল উদ্বেগময়

আরো দশটি মিনিট। সে চিহ্ন ধরে অবশেষে তাঁরা পৌঁছলেন সুগোল একটা উঁচু টিলার মাথায়। নিচে তার মুক্তমঞ্চের মত ছড়ানো বর্ণময় সূর্যাস্তের নির্জন দৃশ্যপট। এহেন জনহীন মনোরম জায়গাটিতে একটি গাছের নিচে পাতা একটি জরাজীর্ন কাঠের বেঞ্চি। আর তাতে বসে গুরুগম্ভীর সব বিষয়ের আলোচনায় ব্যস্ত দুই পাদ্রী। ক্রমান্ধকার দিগন্তে তখনো লেগে রয়েছে সোনালী আর হরিদ্বর্ণের ছোঁয়া, — কিন্তু আকাশের চন্দ্রাতপের ময়ূরপঙ্খী রং ধীরে ধীরে পাল্টে ধরছে নীলকান্ত মণির বর্ণ, তারাদের চেহারাও ক্রমশ হয়ে উঠছে মণিখণ্ডের মত। নীরবে তাঁর সাগরেদদের ইশারা করে ভ্যালেন্টিন চুপিচুপি গিয়ে দাঁড়ালেন সেই শাখাবহুল বিশাল গাছটার পেছনে। নিস্তরঙ্গ নিস্তব্ধতার মধ্যে এই প্রথম কানে এল তাঁর দুই বিচিত্র পাদ্রীর কণ্ঠস্বর।

দুচার মিনিট শোনার পর সংশায়াকুল হয়ে উঠল তাঁর মন। তিনি বোধহয় দু দুটি ইংরেজ পুলিশকে কোন কষ্টকল্পিত কাজে রাতেরবেলা খামোখাই মাঠেঘাটে দৌড় করিয়েছেন। কারণ দুই পাদ্রীই কথা বলছেন পাদ্রীদের মতই। ধীরে সুস্থে ভক্তিভরে তাঁরা পাণ্ডিত্যপূর্ণভাবে আলোচনা করছেন ধর্মতত্ত্বের যত প্রহেলিকাময় উচ্চ সব বিষয়। এসেক্সের ক্ষুদে পাদ্রীটির কথাবার্তা সাদামাটা। কথা বলছেন তিনি আকাশের ক্রমোজ্জ্বল তারাগুলির দিকে গোলাকার মুখখানি তুলে। অন্যজন কথা বলছেন মাথা নিচু করে, মাটির দিকে তাকিয়ে, যেন আকাশের দিকে তাকানোর অধিকার পর্যন্ত তাঁর নেই। কিন্তু সে সব কথাবার্তা কোন শ্বেতবর্ণ ইতালীয় মঠ বা কৃষ্ণবর্ণ স্পেনীয় ক্যাথিড্রালে শুনতে পাওয়া সাধারণ ধর্মালোচনার মতই নিরীহ।

প্রথমে ভ্যালেন্টিন শুনতে পেলেন ফাদার ব্রাউনের বলা কোন কথার শেষাংশ — স্বর্গরাজ্যের অধঃপতন সম্ভব নয় বলে মধ্যযুগে এই কথাই বোঝানো হয়েছিল।

নিচু করা মাথা সম্মতিতে নাড়লেন দীর্ঘাঙ্গ পাদ্রী,

— হ্যাঁ, এইসব আধুনিক বিধর্মীরা যুক্তিরা দোহাই দেয়। কিন্তু এইসব লক্ষকোটি দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে মনে হয় যে হয়ত আমাদের মাথার ওপর আছে এমন সব অভূতপূর্ব জগৎ যুক্তি যেখানে যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

— না, বললেন অন্যজন — যুক্তি সবসময়েই যুক্তিগ্রাহ্য। দুনিয়ার শেষ সীমানাতেও নরকের দুয়ার অবধি যুক্তির রাজত্ব অবাধ। আমি জানি অনেকে

চার্চকে যুক্তির প্রভাব কমানের জন্যে দায়ী করে। কিন্তু সত্য আসলে ঠিক তার বিপরীত — এই পৃথিবীতে একমাত্র চার্চই বলে যে যুক্তির স্থান চূড়ান্ত। একমাত্র চার্চই একথা বলে যে স্বয়ং ঈশ্বরও বদ্ধ যুক্তির কাঠামোতে।

অন্য পাদ্রী তাঁর আত্মসংযমী মুখখানা নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তুলে বললেন।

— কিন্তু কে জানে ওই অনন্ত মহাবিশ্বে —

— অনন্ত স্রেফ তার অস্তিত্বটুকুই — সহসা ঘুরে জবাব দিলেন খর্বকায় পাদ্রী — কিন্তু পৃথিবীর যুক্তির রাজ্যের বাইরে যাবার পক্ষে অনন্ত নয়।

মৌন ক্রোধে প্রায় নিজের নখ উপড়ে ফেললেন ভ্যালেন্টিন। মনে মনে বোধহয় তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন ইংরেজ গোয়েন্দাদ্বয়ের ব্যঙ্গের হাসি। একটা উড়ো ধারনার বশবর্তী হয়ে তিনি তাদের খামোখা এতদুর নিয়ে এসেছেন স্রেফ দুই নিরীহ বুড়ো পাদ্রীর ধর্মালোচনা শোনার জন্য। অধৈর্যের ফলে দীর্ঘদেহী পাদ্রীর বিস্তৃত উত্তর খেয়াল করে শুনলেন না তিনি। আবার যখন কান পাতলেন তখন কথা বলছেন ফাদার ব্রাউন,

— সবচাইতে দুরের নিঃসঙ্গ তারাটিও ন্যায় এবং যুক্তির বাইরে নয়। তাকান ওই তারাগুলির দিকে। কেমন হীরে কিম্বা নীলার মত লাগছে না ওদের? কল্পনা করে নিন কোন উদ্ভট ভূবিজ্ঞানের বা উদ্ভিদবিজ্ঞানের। ধরে নিন ওগুলো স্ফটিকের গাছের হীরের পাতা। ধরে নিন চাঁদের রঙ নীল। যেন একটা বিশাল নীলা। কিন্তু এইসব কল্পনাপ্রসূত জ্যোর্তিবিজ্ঞানের মানে আর যাই হোক, তাতে ন্যায় বা যুক্তির বিন্দুমাত্র তফাৎ হয় না। চন্দ্রমণির মাঠে, মুক্তোর পাহাড়ের নিচেও দেখবেন ঝুলছে নোটিশ 'কদাপি চুরি করিও না'।

তাঁর জীবনের এই প্রথম বিশাল মূর্খতাটিতে ব্যর্থমনোরথ ভ্যালেন্টিন আড়ষ্ট হয়ে গুঁড়ি মেরে বসে থাকা অবস্থা থেকে তখন সবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চুপিচুপি সরে পড়ার মতলব করছেন। কিন্তু দীর্ঘদেহী পাদ্রীটির নিরুত্তর নীরবতায় এমন কি ছিল, যে তিনি ফের কথা না বলা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি। হাঁটুর ওপর হাত রেখে তেমনি মাথা নিচু করে রেখেই পাদ্রীমশাই শুধু বললেন,

— থাক কিন্তু তবু আমি মনে করি যে যুক্তির বাইরে আরো অনেক জগৎ

আছে। এ বিশ্বজগতের রহস্য বুদ্ধির অগম্য। আর তাই আমি শুধু শ্রদ্ধা জানাই নত শিরে।

মাথা তুললেন না দীর্ঘদেহী পাদ্রীমশাই, ভঙ্গীতে বা কণ্ঠস্বরেও তাঁর দেখা গেল না তিলমাত্র পরিবর্তন। শুধু তিনি যোগ করলেন

— তোমার ওই নীলা বসানো ক্রুশখানা আমাকে এবার দিয়ে দেবে নাকি? আমরা ছাড়া এখানে আর কেউ নেই, আর তোমাকে আমি ইচ্ছে করলেই টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারি। কণ্ঠস্বর এবং ভঙ্গীমা বিন্দুমাত্র না পাল্টানোয় কেমন হিংস্র লাগল সেই আকস্মিক প্রসঙ্গান্তর। অথচ মহার্ঘ বস্তুটির রক্ষকটি মাথা ঘোরালেন অতি সামান্যই — আগের মতই হাবাগোবা মুখে চেয়ে রইলেন শুধু তারাদের দিকে। হয় তিনি বুঝতে পারেননি। অথবা বুঝতে পেরে ভয়ে সিঁটিয়ে আছেন।

— হ্যাঁ। সেই একই কণ্ঠে, একই ভঙ্গীতে দীর্ঘদেহী পাদ্রী বললেন - আমি ফ্ল্যাম্বো। তারপর খানিক থেকে ফের বললেন,

— দাও। ক্রুশটা দেবে নাকি?

— না। উত্তর দিলেন অন্যজন। অদ্ভুত শোনাল তাঁর গলা।

তার পাদ্রীর কপট অভিনয় সহসাই পরিত্যাগ করল ফ্ল্যাম্বো। বেঞ্চিতে হেলান দিয়ে নিম্নকণ্ঠে বেশ খানিকক্ষন হাসল অপরাধী শ্রেষ্ঠ। তারপর জোর গলায় বলল,

— না হে দেমাকী পাদ্রী, বোকা ব্রহ্মচারী, তুমি ওটা আমায় দেবে না। বলব কেন দেবে না? কারণ ওটা রয়েছে আমরই বুকপকেটে।

এসেক্সের খর্বকায় পাদ্রী হতবুদ্ধির মত তাকালেন তার দিকে। উৎকণ্ঠিত আগ্রহে বললেন,

— তুমি, তুমি ঠিক জানো?

উল্লাসে চিৎকার করে উঠল ফ্ল্যাম্বো।

— সত্যি তুমি দেখছি আচ্ছা উজবুক। হ্যাঁ হে ওলকপি, আমি ঠিকই জানি। আমি আগে থাকতেই একখানা নকল পার্শেল বানিয়ে রেখেছিলাম। তা

এখন তোমার কাছে সেই নকলখানা, আর আমার কাছে আছে আসলটা। পুরনো কায়দা ফাদার ব্রাউন — পুরনো কায়দা।

— হ্যাঁ, বললেন ফাদার ব্রাউন। হাত বোলালেন মাথার চুলে। আগের মতই প্রহেলিকাময় তাঁর ব্যবহার — এরকমটা আগেও শুনেছি।

অপরাধ জগতের চূড়ামনিটি এবার কৌতূহলে ঝুঁকে পড়ল ক্ষুদে গ্রাম্য পাদ্রীটির ওপর। — তুমি শুনেছ? তুমি আবার কোথা থেকে শুনলে?

খর্বাকৃতি পাদ্রীটি বললেন,

— তার নাম বলতে পারব না তোমাকে। সে খুব অনুতাপী কিনা। বিশ বছর ধরে নকল ব্রাউন পেপারের পার্শেল পাল্টে বেশ স্বচ্ছল অবস্থাতেই কাটিয়েছে সে। তাই তোমায় যখন সন্দেহ করতে আরম্ভ করলাম না, সেই হতভাগার কায়দাটার কথা মনে পড়ে গেল।

উত্তেজিত হয়ে পড়ল অপরাধীটি,

— আমাকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করলেন! তোমার ঘটে এত বুদ্ধি নাকি যে এই খালি মাঠে তোমায় টেনে আনলাম বলে তুমি আমায় সন্দেহ করতে আরম্ভ করলে?

- না, না — প্রায় মাপ চেয়ে ফেললেন ফাদার ব্রাউন - তোমায় যখন প্রথম দেখি তখন থেকেই সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছি। কাঁটা লাগানো বালা যেখানটা পরো তোমার জামার হাতাটা সেখানটা উঁচু হয়েছিল কিনা!

প্রায় আর্তনাদ করে উঠল ফ্ল্যাম্বো

- তুমি আবার কোথা থেকে কাঁটা লাগানো বালার কথা জানলে?

- এই আমার ভক্তদের কাছেই। আর কি! ভুরু কপালে তুলে বললেন ফাদার ব্রাউন - আমি যখন হার্টলপুলের পাদ্রী ছিলাম না, তখন ওখানে ওই রকম কাঁটার বালা পরা জনা তিনেক ছিল। বুঝলে না, তোমাকে গোড়া থেকেই সন্দেহ করেছি তো, তাই ক্রুশটা যাতে ভালোয় ভালোয় ঠিক জায়গায় পৌঁছে যায় তার ব্যবস্থা করতে হল। কিছু মনে কোরো না হে, কিন্তু তোমার ওপর আমার নজর ছিল কিনা, তাই তুমি যখন পার্শেল পাল্টালে আমি তখন দেখতে পেলাম। বুঝলে না, তারপর আমি আবার সেটা পাল্টে দিলাম। তারপর ঠিক প্যাকেটটা ফেলে এলাম।

- ফেলে এলে? পুনরুক্তি করলো ফ্ল্যাম্বো। তার কণ্ঠস্বরে এবার জয়ের আনন্দের বদলে অন্য কিছুর ছোঁয়া।

একই উদাসীন কণ্ঠে ফাদার ব্রাউন বললেন,

- হ্যাঁ গো। আমি করলাম কি, মিষ্টির দোকানে গিয়ে বললাম আমি একটা পার্শেল ফেলে এসেছি। তারপর সেটা পেলে ফেরৎ পাঠানোর জন্যে একটা ঠিকানা রেখে এলাম। আমি কিন্তু জানতাম আমি কিছু ফেলে আসি নি। কিন্তু যখন দ্বিতীয়বার গেলাম, তখন সত্যি সত্যিই ফেলে এলাম পার্শেলটা। তা ওরাও দামী জিনিষটা নিয়ে আমার পেছনে না দৌড়ে এতক্ষণে আমার বন্ধুর কাছে ওয়েস্টমিনিস্টারে ওটা পাঠিয়ে দিয়েছে।

তারপর খানিক দুঃখ জড়ানো গলায় বললেন,

- এই কায়দাটাও আমি হার্টলপুলের এক হতভাগার কাছে শুনেছি। সে রেল স্টেশনে মহিলাদের হাতব্যাগ চুরি করে একই কায়দায় পাচার করত। তা সে বেচারী এখন মঠে থাকে। আমি সব নানা রকম জিনিষ জানি, বুঝলে — মার্জনার ভঙ্গীতে মাথা চুলকোলেন তিনি — আমরা পাদ্রী তো, লোকে আমাদের এসে এসব বলে যায়।

ভেতরের পকেট থেকে একটানে একটা ব্রাউন পেপারের পার্শেল বের করে কুঁচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলল ফ্ল্যাম্বো। কিন্তু ছেঁড়া কাগজ আর সীসের টুকরো ছাড়া তার ভেতর থেকে বেরোল না কিছুই। দৈত্যের মত লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। গর্জ্জন করে বলল,

- আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না। তোমার মত একটা গেঁয়ো ভূত ও কাজ করতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি না। ওটা তোমার কাছেই আছে, আর তুমি যদি ওটা না দাও তাহলে আমরা এখানে একা, তোমার কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নেব।

- না - শুধু এইমাত্র বলেই দাঁড়িয়ে পড়লেন ফাদার ব্রাউন - তুমি জোর করে কাড়তে পারবে না। কারণ প্রথমতঃ ওটা আমার কাছে নেই। আর দ্বিতীয়তঃ আমরা একা নই।

মাঝপথেই দাঁড়িয়ে গেল ফ্ল্যাম্বো।

অঙ্গুলি নির্দেশ করে ফাদার ব্রাউন বললেন,

- ওই গাছের পেছনে আছে দুজন পুলিশ আর একালের সর্বশ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা। ওরা কি করে এখানে এল জানতে চাও? আমি ওদের এখানে এনেছি। কি করে আনলাম? তুমি জানতে চাও তো বলতে পারি। ইশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, কিন্তু অপরাধীদের মধ্যে বছর বিশেক কাজ করলে এ সব ব্যাপার জানতেই হয়। আমি তো পুরোপুরি নিঃসন্দেহে হতে পারছিলাম না যে তুমি চোরই। তারপর আবার একজন পাদ্রীর অবমাননাই বা করি কি করে! তাই ভাবলাম তোমাকে পরীক্ষা করে দেখি তোমার স্বরূপ বুঝতে পারি কি না। সাধারণতঃ লোকে কফিতে নুন হলে হুলস্থুল কান্ড বাধায়। কিন্তু যদি না বাধায় তাহলে তার চুপ করে যাবার নিশ্চই কোন কারণ আছে। আমি নুন আর চিনি পাল্টে দিলাম, কিন্তু তুমি চুপ করেই রইলে। বিলের পরিমাণ তিনগুন বেশী হলে যে কেউ আপত্তি করবে। কিন্তু যদি পয়সা মিটিয়ে দেয় তাহলে কোন কারণে সে লোকের নজর এড়াতে চাইছে। আমি তোমার বিল পাল্টে দিলাম, কিন্তু তবু তুমি পয়সা মিটিয়ে দিলে।

মনে হল ফ্ল্যাম্বো বুঝি এবার বাঘের মতই লাফিয়ে পড়বে। কিন্তু কোন মন্ত্রমুগ্ধবলে স্থানুবৎ দাঁড়িয়ে রইল সে।

গড়গড়িয়ে বলে চললেন ফাদার ব্রাউন,

- তা তুমি তো পুলিশের জন্য কোন সূত্র ছেড়ে যাবে না। তাহলে অন্য কাউকেই সে কাজ করতে হয়। তাই আমরা যেখানেই গেলাম এমন একটা গন্ডগোল বাধালাম যাতে লোকে সারাদিন আমাদের নিয়েই আলোচনা করে। ক্ষতি বিশেষ কিছু করি নি - সূপ ছুঁড়লাম, আপেল উল্টোলাম, জানলার কাঁচ ভাঙলাম। কিন্তু তাতে ক্রুশখানা গেল বেঁচে। সেটা আপাততঃ রয়েছে ওয়েস্ট মিনিস্টারে। তা আমি ভাবছি তুমি আমাকে গাধার শিষ দিয়ে থামালে না কেন?

- কি দিয়ে? প্রশ্ন করল ফ্ল্যাম্বো।

মুখ বেঁকিয়ে ফাদার ব্রাউন বললেন,

- যাক ভাল হয়েছে তুমি ও কায়দাটার কথা তুমি শোননি। তা না হলে ও কাজটা তুমি বেশ ভালভাবেই করতে পারতে। আমি তোমাকে তাহলে ফুটকি দিয়েও থামাতে পারতাম না। আমার পায়ে খুব একটা ভাল জোর নেই কিনা।

- এ সব কি বকছ হে? বলল ফ্ল্যাম্বো।

বেশ বিস্মিত দেখালো ফাদার ব্রাউনকে।

- আমি ভেবেছিলাম তুমি ফুটকির কথা জানো। যাক, তোমার বেশী দূর অধঃপতন হয়নি তাহলে!

- এ সব ভয়ানক কায়দার কথা তুমি জানলে কি করে? আর্তনাদ করে উঠল ফ্ল্যাম্বো।

মৃদু হাসি খেলে গেল ফাদার ব্রাউনের মুখে,

- ওই বোকা ব্রহ্মচারী হয়ে। তোমার কি কখনো মনে হয়নি যে অন্যের পাপের বৃত্তান্ত শোনাই যার পেশা, সে মানুষের অপরাধের সমন্ধে ওয়াকিবহাল না হয়ে যায় না? তাছাড়া আমার পেশার আর একটি বৈশিষ্টের জন্যও বুঝতে পেরেছিলাম যে তুমি পাদ্রী নও।

- কি? বিস্ময়ে মুখব্যাদান করে প্রশ্ন করল তস্কর প্রবর।

- তুমি যুক্তিকে আক্রমণ করলে - বললেন ফাদার ব্রাউন - ও কাজ ধর্মতত্ত্ব বিরুদ্ধ।

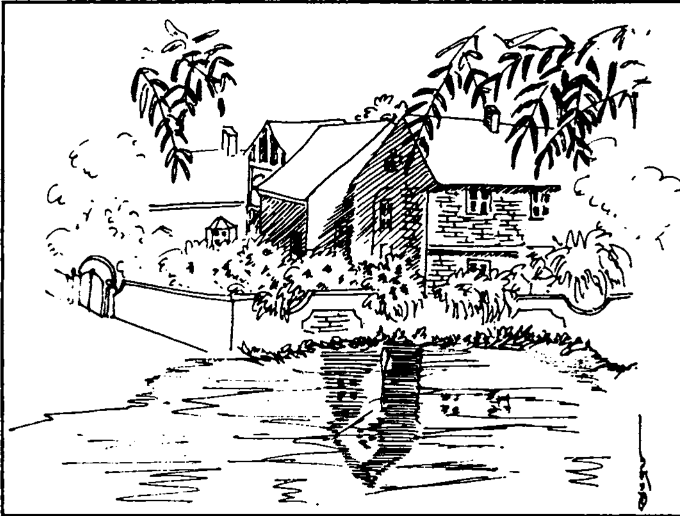
তিনি নিজের জিনিষপত্র গোটানোর জন্য ঘুরতেই সন্ধ্যার অন্ধকারে গাছের মাঝখান থেকে আবির্ভাব হল তিন পুলিশকর্মীর। ফ্ল্যাম্বো স্বভাবে শিল্পী, খেলোয়াড় সুলভ মনোভাব তার, ঝুঁকে সে সেলাম করল ভ্যালেন্টিনকে।

- আমায় সেলাম কোরো না বন্ধু — পরিস্কার গলায় বললেন ভ্যালেন্টিন — চলো আমাদের দুজনের গুরুদেবকে সেলাম করি।

অনাবৃত মস্তকে এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন দুজনেই। আর পিটপিটে চোখে এসেক্সের পাদ্রীমশাই খুঁজতে লাগলেন তাঁর ছাতা।

মৃত্যু উদ্যান

প্যারিস পুলিশের বড়কর্তা অ্যারিস্টিড ভ্যালেন্টিন সময়ে বাড়ি পৌঁছতে পারেননি। তাঁর ডিনারের অতিথিরা এক এক করে আসতে আরম্ভ করেছেন। আর তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর খাস খানসামা ইভানকেই তাদের সামাল দিতে হচ্ছে। বৃদ্ধ ইভান তার জখমি পান্ডুর চেহারা আর পাকা গোঁফজোড়া নিয়ে বসে বাইরের দরজার হলঘরে - যে ঘরের দেওয়ালে নানা অস্ত্রের প্রদর্শনী।



ভ্যালেন্টিনের বাড়িটি তাঁর মতই অভিনব।

ভ্যালেন্টিনের বাড়িটি তাঁর মতই অভিনব। বনেদী বাড়িখানির চারপাশে উঁচু দেওয়াল, আর একপাশে সিন নদীর ওপর ঝুঁকে পড়া পপলারের সারি। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হল বাড়িতে ঢোকার জন্য সামনের দরজা বই আর দ্বিতীয় কোন রাস্তা নেই। আর সেখানে পাহাড়া গেড়ে বসে থাকে ইভান। বাড়ির পেছনে বিরাট সাজানো বাগান - তার চারপাশে গজাল বসানো উঁচু দেওয়াল। বাড়ি থেকে বাগানে আসার বেশ কয়েকটা দরজা থাকলেও বাগান দিয়ে বাইরে বেরোনোর কোন রাস্তা নেই। কয়েকশো অপরাধী যাঁর রক্তদর্শনের জন্য উদগ্রীব

তাঁর জন্যে উপযুক্ত বাগানই বটে।

ভ্যালেন্টিন ফোন করে বলেছেন তাঁর আসতে মিনিট দশেক দেরী হবে - এই কথাই ইভান বোঝাচ্ছিল তাঁর অতিথিদের। সত্যি বলতে অবশ্য ভ্যালেন্টিন একটা মৃত্যুদন্ডের জোগাড়যন্ত্রের ব্যাপারে শেষ মূহুর্তে জড়িয়ে পড়েছেন। আর তাঁর এ ধরণের কাজ যত খারাপই লাগুক না কেন, অন্যান্য কাজের মত এটাও সুষ্ঠু ভাবে করেন তিনি।

কালো পোষাকে গোলাপফুল এঁটে বাড়ি পৌছলেন ভ্যালেন্টিন। কাঁচাপাকা দাড়িতে সুদর্শন পরিচ্ছন্ন চেহারা তাঁর। সটান পৌছলেন পড়ার ঘরে, তারপরে হাতের বাক্সটা যথাস্থানে তালা বন্ধ করে রেখে দাঁড়ালেন এসে বাগানে যাবার খোলা দরজাটায়। সেখানে তখন চোখে পড়ে আকাশের ঝকঝকে চাঁদ লড়াই করছে পলাতক ঝড়ের শতচ্ছিন্ন মেঘের সঙ্গে। যুক্তিবাদী ভ্যালেন্টিনের মনও উদাস হয়ে গেল সে দৃশ্য দেখে। কে জানে, এ ধরণের যুক্তিবাদী মন বুঝিবা কোন ষষ্ঠ অনুভূতির দৌলতেই আগাম আভাস পায় আসন্ন বিপদের। অবশ্য এ ভাব বেশীক্ষণ ঠাঁই পেল না ভ্যালেন্টিনের মনে - মনে পড়ে গেল তাঁর অতিথিরা তাঁরই অপেক্ষা করছে।

বসার ঘরে পোঁছে ভ্যালেন্টিন টের পেলেন যে তাঁর প্রধান অতিথির আগমন না হলেও অন্যান্য হোমরাচোমরারা সবাই পৌছে গেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইংরেজ রাজদূত বদমেজাজী, লালমুখো বুড়ো লর্ড গ্যালওয়ে, বুকে আঁটা রাজপুরস্কারের নীল ফিতে। সঙ্গে স্ত্রী লেডি গ্যালওয়ে শুভ্রকেশ, কৃশাঙ্গী, অভিজাত মহিলা। আর তাঁর কন্যা লেডি মার্গারেট গ্রাহাম - পান্ডুর সুশ্রী চেহারা, বালিকা সুলভ চোখমুখ আর তামাটে চুল। আরও রয়েছেন দুই কন্যাসহ ডাচেস অফ মন্ট সেন্ট মিশেল। কালো চোখ আর বিত্তশালী চেহারা তাঁদের তিনজনেরই। রয়েছেন ফরাসী বিজ্ঞানী ডক্টর সিমন - চশমা আর ছুঁচলো দাড়িতে উন্নাসিক চেহারা, ক্রমাগত ভ্রুকুটি করার ফলে ভাঁজ পড়েছে কপালে। রয়েছেন এসেক্সের কবহোল থেকে আগত ফাদার ব্রাউন, যাঁর সাথে তাঁর সম্প্রতিই মোলাকাত হয়েছিল ইংলন্ডে।

কিন্তু এঁদের ছাড়িয়ে ভ্যালেন্টিনের চোখ গেল উর্দীধারী একটি দীর্ঘকায় ব্যক্তির দিকে। গ্যালওয়েদের সাথে কুশল বিনিময়ে বড় একটা সাড়া না পেয়ে

তিনি এখন এগোচ্ছেন ভ্যালেন্টিনের দিকেই। ইনি হলেন ফরাসী প্রবাসী ফৌজের কমান্ডান্ট ওব্রায়েন। সুঠাম চেহারা, সদম্ভ পদক্ষেপ, কৃষ্ণকেশ, পরিস্কার কামানো মুখ আর নীলনয়ন তাঁর। ফৌজের গৌরবময় পরাজয় আর সফল আত্মহননের ইতিহাস চেহারায় এনেছে তাঁর এক অদ্ভূত বিষণ্ণ তেজস্বীতা। জন্মে ইনি আইরিশ। কৈশোরে বিলক্ষণ পরিচিতি ছিল গ্যালওয়েদের সাথে, বিশেষতঃ মার্গারেট গ্রাহামের সাথে। দেশ ছেড়েছিলেন দেনার দায়ে, আর এখন ব্রিটিশ আদবকায়দার মুখে কালি দিয়ে ডিনারে আবির্ভূত হয়েছেন, উর্দী, কৃপাণ আর রেকাব সমেত। তাঁর অভিবাদনের জবাবে গ্যালওয়ে দম্পতি প্রত্যাভিবাদন সারলেন অত্যন্ত আড়ষ্ঠ ভাবেই। লেডি মার্গারেট তাও না করে শুধু মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

তবে তাঁর অতিথিদের একে অন্যের ব্যাপারে যত আগ্রহই থাকুক না কেন, ভ্যালেন্টিনের কিন্তু তাঁদের কারোর ব্যাপারেই কোন কৌতূহল নেই। তাঁর দৃষ্টি শুধু সন্ধান করে ফিরছে তাঁর প্রধান অতিথির প্রত্যাশায়। ভ্যালেন্টিন আজ উন্মুখ তাঁর সেই পৃথিবী বিখ্যাত বন্ধুটির জন্যে, যাঁর সাথে বন্ধুত্ব হয়েছিল তাঁর আমেরিকা ভ্রমনের কালে। নাম তাঁর জুলিয়াস ব্রেইন। কোটিপতি এই ভদ্রলোক মুক্ত হস্তে অর্থদান করেছেন বহু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ধার্মিক সম্প্রদায়কে - আর তা নিয়ে বহু লেখাও হয়েছে ইংরেজ এবং মার্কিন সংবাদপত্রগুলিতে। ব্যঙ্গতিক্ত হলেও যথেষ্ট সশ্রদ্ধ সে সব লেখা।

মিঃ ব্রেইন যে ঠিক কোন সম্প্রদায়ভুক্ত - তিনি নাস্তিক, মর্মন না ক্রিশ্চান সায়েন্টিস্ট - তা কেউ জানে না। কিন্তু যে কোন বুদ্ধিজীবি প্রয়াসেই তিনি টাকা ঢালতে সমানভাবে মুক্ত হস্ত। বিচিত্র মানুষ ইনি। যেমন বহুকাল সধৈর্য্যে অপেক্ষা করে আছেন ইনি আমেরিকান শেক্সপীয়ারের আবির্ভাবের আশায়। ওয়াল্ট হুইটম্যানের অনুরাগী হলেও লুক পি ট্যানারকে ভাবেন বেশী আধুনিক। এমন কি ভ্যালেন্টিনকে- অমূলকভাবেই-আধুনিক বলেই পছন্দ করেন তিনি।

জুলিয়াস কে ব্রেইনের আগমনের মূহুর্তটিকে নাটকীয় বলা চলে। কারণ তাঁর চরিত্রের বিশালতা এমনই, যে তাঁর উপস্থিতি আর অনুপস্থিতি দুটোই টের পাওয়া যায় সহজেই। সুবিশাল আয়তন, দৈর্ঘে প্রস্থে প্রায় সমান, পরণে কালো সান্ধ্য পরিচ্ছদ, নিরাভরণ চেহারায় কোন আঙটি বা ঘড়ির চেনের চিহ্ন নেই।

মাথার রজতশুভ্র চুল উল্টে ব্রাশ করা জার্মানদের মতন। লাল মুখখানি একাধারে নিষ্পাপ কিন্তু তেজস্বী। ঠোঁটের নিচে দাড়ির গোছা মুখে এনেছে খানিকটা নাটকীয় কুটিলতার ছাপ। অবশ্য তাঁর দিকে বেশীক্ষণ নজর দেবার সময় হল না সবার। তাঁর বিলম্বের দরুণ ইতিমধ্যেই খানিকটা ঘরোয়া সমস্যা দেখা দিয়েছে, তাই লেডি গ্যালওয়ের হাত ধরে তাঁকে পত্রপাঠ পাঠিয়ে দেওয়া হল খাবার ঘরে।

সাধারনতঃ ভদ্র অমায়িক ব্যবহার গ্যালওয়েদের। বাউন্ডুলে ওব্রায়েনের মেয়ের সাথে মেলামেশা করার ব্যাপারটুকু ছাড়া আর কোন কিছুতেই বড় একটা আপত্তি নেই তাঁদের। কন্যাও অবশ্য পিতৃআজ্ঞা মাথায় রেখে খাবার ঘরে ঢুকেছিলেন ডক্টর সিমনের সাথেই। কিন্তু হলে কি হবে, মেয়ের চিন্তায় ছটফটিয়ে মাঝে মধ্যেই অভদ্রতার পর্যায়েই পৌছে যাচ্ছিলেন বুড়ো লর্ড গ্যালওয়ে। ডিনারের সময়টুকু কোন ভাবে কাটিয়ে দিলেও, ডিনারের পর যখন তিন অল্পবয়সী - ডাক্তার সিমন, পাদ্রী ব্রাউন আর যখন রওয়ানা হলেন মহিলাদের সঙ্গে গল্পগুজব করতে, বা কাঁচের বাগানঘরে সিগার ফুঁকতে, তখন কূটনীতিক রাজদূত বড়ই অধৈর্য্য হয়ে পড়লেন। প্রতি মূহুর্তে তাঁর মনে হতে লাগল এই বুঝিবা পাজী ওব্রায়েনটা তাঁর মেয়েকে যেভাবেই হোক কোন ইশারা করেই বসে।

কফির পালা এলে গ্যালওয়ে কিভাবেই হোক আটকে গেলেন ব্রেইন আর ভ্যালেন্টিনের সাথে। একজন প্রাচীন আমেরিকান - সমস্ত ধর্মমতে বিশ্বাসী। আর অন্যজন প্রৌঢ় ফরাসী - সমস্ত ধর্মমতেই বিলক্ষণ অবিশ্বাসী। খাণিক্ষণের মধ্যেই তাঁদের 'আধুনিক' বিতর্ক অসহ্য বোধ হওয়াতে, রওয়ানা হলেন তিনি বসার ঘরের দিকে। পথে লম্বা অলিগলির মধ্যে ছসাত মিনিট পথ হারিয়ে ঘোরার পর কানে এল তাঁর ডাক্তার সিমনের উঁচু মাস্টারী গলা, পাদ্রী ব্রাউনের নিম্নস্বর, আর হাসির শব্দ। এরাও বুঝি এবার বিজ্ঞান বনাম ধর্ম নিয়ে তর্ক করছে, এই ভেবে বিরস মনে ঘরের দরজা খুলতেই চোখে পড়ল কমান্ডান্ট ওব্রায়েন আর লেডি মার্গারেট দুজনেই উধাও।

বসার ঘর ছেড়ে গ্যালওয়ে অস্থিরভাবে পাড়ি দিলেন খাবার ঘরের দিকে। লক্ষীছাড়া আইরিশটার খপ্পর থেকে মেয়েকে বাঁচানোর চিন্তায় মেজাজ তাঁর তখন সপ্তমে। কিন্তু বাড়ির পেছন দিকে, ভ্যালেন্টিনের পড়ার ঘর অবধি পৌছতে না পৌছতেই ঝড়ের বেগে তাঁর পাশ কাটিয়ে চলে গেল কন্যা মার্গারেট, মুখ তাঁর ক্রোধে পান্ডুর।

অবাক হলেন গ্যালওয়ে। মেয়ে যদি তাঁর ওব্রায়েনের সঙ্গে থেকেই থাকে তাহলে সে গেল কোথায়? আর যদি ওব্রায়েনের সঙ্গে না থেকে থাকে তবে গিয়েছিল কোথায়?

তাঁর রাগের সঙ্গে এবার যোগ হল যত অলীক সন্দেহ। হাঁতড়ে হাঁতড়ে কোন মতে পৌঁছে গেলেন বাড়ির পেছনদিকে বাগানে যাবার একটা খিড়কি দরজায়। বাগান ভেসে যাচ্ছে রজতশুভ্র জোৎস্নায়। নীল পোযাক পরা কেউ লম্বা পায়ে বাগান পেরিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়ল পড়ার ঘরের জানলা দিয়ে। চাঁদের আলোয় চিনতে পারলেন তাকে গ্যালওয়ে-ওব্রায়েন।

লর্ড গ্যালওয়ের মানসিক অবস্থা হল অবর্ণনীয়। তাঁর মনে হল সামনে ছড়ানো চন্দ্রালোকিত বাগানখানা ব্যঙ্গ করছে তাঁর ক্ষমতাকে। কমান্ডান্ট ওব্রায়েনের সদর্প পদক্ষেপের ওপর ক্রোধে অধীর হলেন তিনি। এমনকি চাঁদের আলো পর্যন্ত অসহ্য মনে হতে লাগল তাঁর। তাঁর মনে হল কোন যাদুবলে তিনি আটকে পড়েছেন্ কোন এক কপোলকল্পিত মায়াকাননে, যার প্রভাব কাটতে পারে শুধু বাকবিতর্কে। সুতরাং দ্বিধা না করে তৎক্ষণাৎ পশ্চাদ্গমন করলেন শত্রু ওব্রায়েনের।

কিন্তু বেশীদূর যেতে পারলেন না। হোঁচট খেলেন কিছুতে। বিরক্তিভরে একবার ঝুঁকে দেখে, আবার দেখলেন বিস্ময়ভরে। ফল হল অদ্ভুত। চাঁদের আলোয়, ঝাউগাছের মধ্য দিয়ে প্রৌঢ় রাজদূত দৌড় দিলেন তারস্বরে চিৎকার করতে করতে।

সেই আওয়াজে পড়ার ঘরের দরজায় আবির্ভাব হল ডক্টর সিমনের চশমা আর ভ্রুকুটির। তাকেই দিলেন খবর লর্ড গ্যালওয়ে,

- লাস! ঘাসের ওপর একটা রক্তাক্ত লাস পড়ে আছে!

মাথা থেকে তাঁর তখন ওব্রায়েনের চিন্তা উধাও।

লর্ড গ্যালওয়ে সাহস করে যতটা দেখেছেন, ভাঙা ভাঙাভাবে সেটা কোনমতে বোঝালেন সিমনকে।

-আমাদের কপাল ভালো, যে ভ্যালেন্টিন এখানেই আছেন, বললেন ডক্টর সিমন - তাঁকে এক্ষুনি জানানো দরকার

বলতে বলতেই পড়ার ঘরে ঢুকলেন ভ্যালেন্টিন। চিন্তিত ভাবে চলে এসেছেন চিৎকার শুনে। ভেবেছেন অসুস্থ হয়ে পড়েছে তাঁর কোন অতিথি বা ভৃত্য। কিন্তু আসল ঘটনা শোনার পর তৎপরতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর চেহারা। কারণ অন্যের যত খারাপই লাগুক না কেন, এইসব নৃশংস ব্যাপারই ভ্যালেন্টিনের পেশা।

- সারা পৃথিবী ছুটে বেরিয়েছি রহস্যের সন্ধানে, আর দেখুন দেখি, রহস্য এসে হাজির হয়েছে আমারই দোরগোড়ায় - বাগানের দিকে পাড়ি দিতে দিতে বললেন ভ্যালেন্টিন - কই জায়গাটা দেখি?

নদী থেকে ওঠা কুয়াশায় অল্প অল্প আচ্ছন্ন হতে আরম্ভ করেছে লনটা। সেটা পার হতে খানিক অসুবিধে হলেও, ভয়বিহ্বল গ্যালওয়ের সাহায্যে সবাই খুঁজে পেলেন মৃতদেহটা। ঘাসের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে দীর্ঘদেহী বৃষস্কন্ধ পুরুষমানুষের চেহারা। পরণে কালো পোযাক, কেশ বিরল টাকে লেপ্টে আছে স্রেফ একগাছি লালচে চুল, আর মুখের তলা দিয়ে আঁকাবাঁকা ভাবে গড়িয়ে এসেছে লাল রক্তের ধারা।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন সিমন,

- যাক, আমাদের কেউ নয় বলেই মনে হচ্ছে!

- ভাল করে পরীক্ষা করে দেখুন ডাক্তার, এখনো মৃত্যু না হয়ে থাকতে পারে, আদেশ দিলেন ভ্যালেন্টিন।

- শরীরটা এখনো পুরো ঠান্ডা হয়নি, কিন্তু প্রাণ নেই - ঝুঁকে পড়ে বললেন ডক্টর সিমন - চলুন ধরাধরি করে তুলি।

সবাই মিলে দেহটাকে মাটি থেকে অল্প তুলতেই মৃত্যুর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল ভয়াবহ ভাবে - মুন্ডুটা গড়িয়ে গেল একপাশে। শরীর থেকে গর্দান পুরোপুরি আলাদা করে দিয়েছে খুনী। এমনকি ভ্যালেন্টিন পর্যন্ত আঁতকে উঠলেন,

- খুনী বোধহয় শরীরে অসুরের শক্তি ধরে - বললেন তিনি।

অঙ্গচ্ছেদ ডাক্তার সিমনের কাছে নতুন কিছু নয়। কিন্তু তবু কম্পিত হস্তে

মাথাটাকে তুললেন তিনি। চিবুক আর ঘাড়ে ক্ষতচিহ্ন থাকলেও মুখখানা মোটামুটি অক্ষতই। পীতবর্ণ, ভারিক্কী, সে মুখ - কেমন জানি একই সাথে স্ফীত অথচ কোটরাগত। স্থূল অক্ষিপল্লব আর বাজের ঠোঁটের মতন বাঁকা নাক। বুঝিবা কোন নিষ্ঠুর রোমক সম্রাটের মুখের আদলের সঙ্গে ইষৎ মিশেছে কোন চৈনিক সম্রাটের



কম্পিত হস্তে মাথাটাকে তুললেন

মুখচ্ছবি। উপস্থিত সবার কাছেই অজ্ঞাত চেহারাখানা। আর বেশি কিছু বোঝা গেল না মৃতের সমন্ধে। শুধু দেহখানা তুলতে নজরে পড়ল পরিধানের রক্তলিপ্ত সাদা জামাখানা। এ রাতের অতিথি সে না হলেও পোষাক আষাক তার নিমন্ত্রিতদের মতনই।

মৃতদেহের আশেপাশে প্রায় কুড়ি গজ অবধি খুঁটিয়ে দেখলেন ভ্যালেন্টিন। তাঁকে অনভিজ্ঞ ভাবে হলেও খানিক সাহায্য করলেন সিমন এবং খানিকটা উদাস ভাবেই লর্ড গ্যালওয়ে।

ফল অবশ্য পেলেন না কেউ বেশী। কিছু কুচনো ডালপালা ছাড়া চোখে পড়ল না বিশেষ কিছুই।

- নাঃ - গম্ভীর ভাবে বললেন ভ্যালেন্টিন - কিছু কুঁচনো ডালপালা আর এই ছিন্ন শির আগন্তুকের মৃতদেহ ছাড়া এখানে আর কিছু নেই।

উত্তরে নিশ্চুপ নিস্তব্ধ রইলেন সকলে। কিন্তু হঠাৎই চিৎকার করে উঠলেন লর্ড গ্যালওয়ে,

- কে? কে? ওখানে দেওয়ালের পাশে কে?

চন্দ্রালোকিত কুয়াশার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে এল একটি বৃহদমস্তক, খর্বাকৃতি মূর্তি - যেন কোন প্রেতাত্মা। কাছে এলে বোঝা গেল এটি সেই ছোটখাট পাদ্রীটি, যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল বসার ঘরে। মিনমিন করে বলল,

- বলি, খেয়াল করেছেন, বাগানে কোন ফটক নেই।

পাদ্রী দর্শনে কুটিল হয়েছিল যুক্তিবাদী ভ্যালেন্টিনের ভ্রুকুটি, কিন্তু কথাটার তাৎপর্য এড়িয়ে যাবার মানুষ তিনি নন, তাই বললেন,

- ঠিক বলেছেন। লোকটা খুন কিভাবে হল বুঝতে হলে আমাদের জানা দরকার এ এখানে এল কি ভাবে। সবাই শুনুন - এখানে যাঁরা আছেন, তারা সবাই সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা। এঁদের মধ্যে একজন রাজদূতও রয়েছেন। আমার কাজের ক্ষতি না করে যতদূর সম্ভব তাঁদের নাম এ ব্যাপারে জড়িয়ে না পড়তে দেওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। ব্যাপারটা একবার জানাজানি হয়ে গেলে তখন নিয়মমাফিক অনুসন্ধান করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। কিন্তু পুলিশকর্তা হবার সুবাদে আমি খানিক্ষণ এটাকে গোপন রাখতে পারি। লোকজন ডাকার আগে আমি নিজে আগে আমার অতিথিদের নির্দোষিতা প্রমাণ করব। কথা দিন কাল দুপুরের আগে কেউ বাড়ি ছেড়ে যাবেন না। প্রত্যেকের শোবার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। সিমন, সামনের হলঘরে আমার বিশ্বাসী খানসামা ইভানকে পাবেন। তাকে বলবেন অন্য কোন ভৃত্যকে দরজায় বসিয়ে এক্ষুণি আমার কাছে চলে আসতে। লর্ড গ্যালওয়ে, মহিলাদের খবর দেবার পক্ষে আপনিই সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি - সবকথা খুলে বলুন, দেখবেন যেন আতঙ্ক না ছড়ায়। আমি আর ফাদার ব্রাউন লাসের কাছে থাকব।

বিনা দ্বিধায় পালিত হল ভ্যালেন্টিনের আদেশ। সিমন গিয়ে পাকড়াও

করলেন গোয়েন্দা ভ্যালেন্টিনের গোয়েন্দা ইভানকে। গ্যালওয়ে বসার ঘরে গিয়ে খবরটা দিলেন বেশ নিপুণভাবেই, যাতে সবাই সেখানে জড় হবার আগেই কেটে গেল মহিলাদের চমক আর বিহ্বলতার জের। আর কট্টর যুক্তিবাদী এবং কট্টর পাদ্রী ধর্মবিশ্বাসের দুই মেরুর মত চন্দ্রালোকে দাঁড়িয়ে রইলেন মৃতদেহের পায়ের আর মাথার কাছে।

গোঁফ আর জখম নিয়ে বাড়ির ভেতর থেকে তীরবেগে পোষা কুকুরের মত মালিকের কাছে ছুটে এল বিশ্বাসী ইভান। রক্তিম মুখ তাঁর এক অশালীন আগ্রহে উজ্জ্বল। ভ্যালেন্টিনের অনুমতি চাইল সে লাশটাকে পরীক্ষা করার।

- দেখতে চাইলে দেখতে পার ইভান - বললেন ভ্যালেন্টিন - কিন্তু বেশী সময় নিওনা। বাড়ির ভেতর গিয়ে ব্যাপারটার ফয়সালা করতে হবে।

মাথাখানা তুলে দেখে হাত থেকে প্রায় ফেলেই দিচ্ছিল ইভান,

- এ, এ অসম্ভব — চেনেন নাকি হুজুর লোকটাকে?

বড় একটা উৎসাহ দেখালেন না ভ্যালেন্টিন,

- না চিনি না। চলো ভেতরে যাওয়া যাক।

লাসটাকে সবাই মিলে ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে রাখলেন পড়ার ঘরের সোফায়, আর তারপরে গিয়ে পৌছলেন বসার ঘরে।

কতকটা ইতস্ততঃ ভাবেই ধীরে ধীরে একটা ডেস্কে গিয়ে বসলেন ভ্যালেন্টিন। বিচারকের কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন চারপাশে, তারপর একটা কাগজে খসখস করে দুকলম লিখে প্রশ্ন করলেন,

- সবাই এখানে আছেন তো?

- মিষ্টার ব্রেইন নেই, উত্তর দিলেন ডাচেস ওফ মন্ট সেন্ট মিশেল।

- না - কর্কশ কণ্ঠে সায় দিলেন লর্ড গ্যালওয়ে - এবং মিষ্টার নীল ওব্রায়েনও নেই। তাঁকে তো খানিক আগে তাজা মড়াটার পাশে হাওয়া খেতে দেখলাম।

নির্দেশ দিলেন ভ্যালেন্টিন,

- ইভান, কমান্ডান্ট ওব্রায়েন আর মিষ্টার ব্রেইনকে ডেকে আনো। মিষ্টার ব্রেইন খাবার ঘরে বসে সিগার টানছেন, আর ওব্রায়েন খুব সম্ভবতঃ কাঁচের বাগানঘরে পায়চারী করছেন।

প্রভুর আদেশ তামিল করতে মুহূর্তে উধাও হল ইভান। অন্য কাউকে কিছু বলার সুযোগ দিলেন না ভ্যালেন্টিন। দৃঢ়স্বরে বললেন,

- সবাই জানেন, বাগানে একটা মৃতদেহে পাওয়া গেছে, মৃতের ধড় থেকে মুন্ডু দুফাঁক করে কাটা। ডঃ সিমন, আপনি তো লাসটা পরীক্ষা করেছেন। আপনার কি মনে হয় ওভাবে মুন্ডচ্ছেদ করতে ভয়ানক দৈহিক শক্তির প্রয়োজন? নাকি খুব ধারলো ছুরি দিয়েও একাজ সম্ভব?

- ছুরি দিয়ে কোনমতেই একাজ সম্ভব নয় - বললেন ডঃ সিমন। মুখ তাঁর উৎকণ্ঠায় পান্ডুর।

- কি ধরনের অস্ত্রে একাজ করা হয়েছে বলে আপনার মনে হয়? প্রশ্ন করলেন ভ্যালেন্টিন।

- আধুনিক যুগের কোন অস্ত্রের কথা তো মাথায় আসছে না - বললেন ডঃ সিমন; চিন্তার রেখা পড়ল তাঁর কপালে - মানুষের ঘাড় কুপিয়ে কাটাই বেশ দুরূহ ব্যাপার, আর এতো মনে হচ্ছে এক কোপে কাটা হয়েছে। অবশ্য প্রাচীন যুগের রণকুঠার, জল্লাদের কুঠার কিম্বা জোড়া হাতের তলোয়ার দিয়ে একাজ সম্ভব।

- হা ভগবান! আর্তনাদ করে উঠলেন ডাচেস, প্রায় মুর্চ্ছাগত অবস্থা তাঁর - কিন্তু এখানে রণকুঠার বা জোড়া হাতের তলোয়ার আসবে কোথা থেকে?

ভ্যালেন্টিনের মন তখনো সামনের কাগজের ওপর। লিখতে লিখতেই প্রশ্ন করলেন,

-আচ্ছা বলুনতো, ফরাসী অশ্বারোহীদের লম্বা কৃপাণ দিয়ে একাজ করা সম্ভব কি?

দরজায় আওয়াজ হল মৃদু করাঘাতের। সে আওয়াজে কোন অজানা কারণে

রক্ত হিম হয়ে গেল সবার। আর সেই জমাট নিস্তব্ধতার মধ্যে কোনমতে বললেন ডঃ সিমন,

- কৃপাণ? হ্যাঁ, কৃপাণ দিয়ে বোধহয় একাজ সম্ভব।

- ধন্যবাদ, বললেন ভ্যালেন্টিন - এস ইভান।

দরজা খুলে কমান্ডান্ট ওব্রায়েনকে ভেতরে নিয়ে এল বিশ্বাসী ইভান। ধরে এনেছে বাগান থেকে, যেখানে নাকি ফের পায়চারী করছিলেন ভদ্রলোক।

ভঙ্গীমা দিশেহারা হলেও উদ্ধত আইরিশ অফিসারটির। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন,

- কি চান আমার কাছে?

- দয়া করে বসুন এখানে - শান্ত স্বরে বললেন ভ্যালেন্টিন - আপনার তলোয়ারটা সাথে দেখছি না যে? কোথায় রেখে এসেছেন?

- লাইব্রেরীর টেবিলে - বললেন ওব্রায়েন; উৎকন্ঠার ছাপ তাঁর উচ্চারণে - ওটা নিয়ে সাথে নিয়ে বড্ড অসুবিধে হচ্ছিল।

- ইভান, লাইব্রেরী থেকে কমান্ডান্ট ওব্রায়েনের তলোয়ারখানা নিয়ে এস, বললেন ভ্যালেন্টিন। আদেশ পালনে ইভান উধাও হতে ফিরলেন ওব্রায়েনের দিকে,

- লর্ড গ্যালওয়ে মৃতদেহখানা আবিষ্কার করার আগে আপনাকে বাগান ছেড়ে চলে যেতে দেখেছেন। কি করছিলেন বাগানে?

ধপাস করে একখানা চেয়ারে বসে পড়লেন ওব্রায়েন। আইরিশ উচ্চারণে বললেন,

- চাঁদের শোভা দেখছিলাম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করছিলাম। আর কি করব?

নেমে এল আবার জমাট নীরবতা, আবার দরজায় হল সেই মৃদু অথচ ভয় জাগানো করাঘাত। ঘরে ঢুকল ইভান, হাতে তৈরী খালি একখানা তলোয়ারের খাপ।

- শুধু এইখানাই পেলাম, বলল সে।

চোখ তুলে দাঁড়ানোর প্রয়োজন মনে করলেন না ভ্যালেন্টিন। শুধু বললেন,

- টেবিলে রেখে দাও।

কাঠগোড়ায় খুনী আসামী উঠলে যেমন সবাই নিশ্চুপ হয়ে পড়ে, তেমনি নীরব হয়ে গেল ঘর। ডাচেসের মৃদু কাতরোক্তি থেমে গিয়েছিল অনেক আগেই। ঠান্ডা হয়ে জুড়িয়ে এসেছিল গ্যালওয়ের অদম্য ক্রোধ। অপ্রত্যাশিত ভাবে শুধু মুখ খুললেন লেডি মার্গারেট। কম্পিত কণ্ঠস্বরে তাঁর নির্ভীক মহিলার সত্য প্রকাশের প্রয়াস সুস্পষ্ট,

- আমি বলছি নীল ওব্রায়েন বাগানে কি করছিলেন - কারণ ভদ্রতার খাতিরে উনি মুখ খুলবেন না। উনি আমাকে বিবাহের প্রস্তাব দিচ্ছিলেন। আমি রাজী হইনি। আমি ওঁকে বললাম যে পারিবারিক স্বার্থে আমার পক্ষে আমার শ্রদ্ধা ছাড়া ওনাকে আর কিছু দেওয়া সম্ভব নয়। উনি তাতে রাগ করলেন, বললেন আমার শ্রদ্ধার ওনার প্রয়োজন নেই।

কথা থামিয়ে করুণ হাসি হাসলেন মার্গারেট। বললেন,

- আমি জানি না, উনি এখনো আমার শ্রদ্ধা প্রত্যাখান করবেন কিনা, কিন্তু ওনার ওপর শ্রদ্ধা আমার এখনো অটুট। আমি হলফ করে বলতে পারি উনি একাজ কিছুতেই করেননি।

গ্যালওয়ে সরে গেলেন কন্যার দিকে। চেষ্টা করেও নামিয়ে রাখতে পারলেন না গলা, চড়ে গেল মৃদুস্বর,

- চুপ করো ম্যাগি। কেন বাঁচানোর চেষ্টা করছ এ লোকটাকে? ওর তলোয়ারখানা কোথায়? কোথায় ওর হতচ্ছাড়া কৃপাণ ———

কন্যার কঠিন চাহনি মাঝপথেই থামিয়ে দিল লর্ড গ্যালওয়েকে। সে জ্বলন্ত দৃষ্টির দিকে ঘর শুদ্ধু লোকের চোখ আটকে গেল চুম্বকের মতই।

নিচু কণ্ঠস্বরে কথা বললেন মার্গারেট, কিন্তু শ্রদ্ধার লেশ মাত্র নেই সে স্বরে,

-বুড়ো বয়সে কি ভীমরতি ধরেছে? কি প্রমাণ করতে চাইছ খেয়াল আছে?

আমি বলেছি উনি আমার সঙ্গে ছিলেন এবং উনি কিছু করেননি। উনি যদি অপরাধী হনও, তাহলে ওনার সঙ্গী ছিলাম আমি। বাগানের খুন যদি উনিই করে থাকেন তাহলে তার সাক্ষী কে? কার জানার কথা খুনের ব্যাপারে? নীলের ওপর তোমার কি এতই রাগ যে তুমি তোমার মেয়েকে পর্যন্ত ——

আর্তনাদ করে উঠলেন লেডি গ্যালেওয়ে। শিহরণ খেলে গেল বাকি সবার শরীরে, যেন কোন বিয়োগান্ত নাটকের শেষ কুটিল পরিণাম দেখছেন। মনে হতে লাগল বনেদী স্কট মহিলার পান্ডুর মুখ আর তাঁর দুঃসাহসী প্রেমিকের চেহারা বুঝিবা কোন নিরালোক গৃহে টাঙানো পুরাতন প্রতিকৃতি। নিহত পতি আর বিষার্ত প্রেমিকের নানা প্রাচীন কাহিনীর কল্পনায় নীরব হলেন সবাই।

সুদীর্ঘ সেই বিষাদক্লিষ্ট নিস্তব্ধতা সহসা ভাঙল একটা সরল প্রশ্নে,

- সিগারখানা কি খুব লম্বা ছিল?

চমকে আশেপাশে তাকালেন সবাই, প্রশ্নকর্তা কে তা দেখার জন্য।

- মানে বলছি কি - ঘরের এক কোন থেকে ভেসে এল খর্বকায় ফাদার ব্রাউনের গলা - এতক্ষণ ধরে মিঃ ব্রেইন যে সিগারখানি টানছেন সেটা নিশ্চই খুব লম্বা হবে? তা একগাছা লাঠির মত?

কথাটার নিহিত ব্যঙ্গে বিরক্ত হলেও সায় দিলেন ভ্যালেন্টিন,

- ঠিক বলেছেন। ইভান আর একবার মিঃ ব্রেইনকে খুঁজে এখানে নিয়ে এস।

খানসামা বেরিয়ে দরজা টেনে দিতেই ভ্যালেন্টিন সাগ্রহে ফিরলেন মার্গারেটের দিকে। বললেন,

- লেডি মার্গারেট, লোক লজ্জা উপেক্ষা করে কমান্ডান্ট ওব্রায়েনের সম্বন্ধে সত্য প্রকাশের যে সাহস আপনি দেখিয়েছেন তার জন্যে আমাদের প্রশংসা আর ধন্যবাদ দুই-ই আপনার প্রাপ্য। কিন্তু একটা ছোট্ট প্রশ্ন আছে। লর্ড গ্যালওয়ে পড়ার ঘর থেকে বসার ঘরে যাবার আগে আপনি তাঁর পাশ কাটিয়ে যান। এর কয়েক মিনিট পরই উনি পৌঁছন বাগানে, এবং সেখানে দেখতে পান কমান্ডান্ট ওব্রায়েনকে।

মৃদু শ্লেষের স্বরে উত্তর দিলেন মার্গারেট,

- আপনার মনে থাকা উচিত, আমি ওনার প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছিলাম। তার পরেও কি আমাদের দুজনের হাত ধরাধরি করে ফেরৎ আসা সম্ভব? উনি যথার্থ ভদ্রলোক, পেছনে রয়ে গেলেন - এবং তাই ধরা পড়ছেন খুনের দায়ে।

- সেই দুচার মিনিটে - গম্ভীরভাবে বললেন ভ্যালেন্টিন - উনি হয়ত ——

আবার করাঘাত হল দরজায়, উঁকি দিল ইভানের চোট খাওয়া মুখ।

-মাপ করবেন হুজুর, কিন্তু মিঃ ব্রেইন বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন।

- চলে গেছেন ! চেঁচিয়ে এই প্রথম লাফিয়ে উঠলেন ভ্যালেন্টিন।

- চলে গেছেন ! কেটে পড়েছেন ! ভেগে পড়েছেন! - পরিহাসের স্বরে উত্তর দিলে ইভান - ওনার কোট আর টুপিও উধাও হয়ে গেছে। তারপর যা হয়েছে শুনলে তো আক্কেলগুড়ুম হয়ে যাবে। আমি বাইরে অবধি ছুটে গিয়েছিলাম যদি ওনার কোন চিহ্ন পাই। পেলামও অবশ্য চিহ্ন - বেশ বড়সড় চিহ্নই।



হাতে একখানা ঝকঝকে খোলা তলোয়ার

- কি বোঝাতে চাইছ কি? প্রশ্ন করলেন ভ্যালেন্টিন।

- দেখাচ্ছি - বলে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে ফেরৎ এল ইভান। হাতে একখানা ঝকঝকে খোলা তলোয়ার, রক্তের চিহ্ন তার আগায় আর ধারে।

বাজ পড়ল যেন ঘরে।

- প্যারিস যাবার রাস্তায় পঞ্চাশ গজ দূরে পড়ে ছিল এটা - বলে চলল অভিজ্ঞ ইভান - আপনাদের মাননীয় ব্রেইন মহাশয় পালানোর সময়ে বোধকরি ওটা ওখানে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছেন।

সম্পূর্ণ নতুন ধরণের এক নিস্তব্ধতা এবার নেমে এল ঘরে। তলোয়ারখানা তুলে নিলেন ভ্যালেন্টিন, ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে নিজের মনে কি ভাবলেন গভীর মনযোগ দিয়ে, তারপরে সশ্রদ্ধ ভঙ্গিমায় ফিরলেন ওব্রায়েনের দিকে,

- কমান্ডান্ট, আশা করি আপনি পুলিশের পরীক্ষার জন্যে যখনই দরকার হবে তখনই আপনি হাজির করবেন এই অস্ত্রখানা। কিন্তু - খটাস করে তলোয়ারখানা খাপে বন্ধ করে ফেললেন ভ্যালেন্টিন - আপাততঃ আপনার তলোয়ার আমি আপনাকে প্রত্যর্পণ করছি।

ভ্যালেন্টিনের এই কাজের নিহিত বীররসের প্রশংসায় উচ্ছসিত হলেন সবাই। নীল ওব্রায়েনের ভাগ্যের চাকাও যেন ঘুরে গেল এই মুহুর্ত থেকেই। রক্তিম ভোরে আবার যখন তিনি ভ্যালেন্টিনের রহস্য উদ্যানে বিচরণে ব্যস্ত, তখন তাঁর অতি সাধারণ জীবনের কালিমা মুছে গেছে তাঁর মন থেকে, এসেছে নতুন খুশীর জোয়ার। লর্ড গ্যালওয়ে স্বভাবে ভদ্রলোক, তাঁর কাছে মাপ চেয়ে গেছেন। আভিজাত্যের বর্ম ভেঙে লেডি মার্গারেট অবশেষে কাছে এসেছেন নারী হয়ে। প্রাতরাশের আগে তাঁর সাথে কুসুমকুঞ্জে বেড়াতে বেড়াতে ওব্রায়েন তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়াও পেয়েছেন অনেক বেশী কিছু।

সবারই মন এখন আগের থেকে প্রফুল্ল, দয়ার্দ্র। হত্যার রহস্যের সমাধান না হলেও সন্দেহের কালো মেঘ সরে গেছে সবার ওপর থেকেই, পশ্চাদগমন করছে প্যারিসের দিকে পলাতক সবার অপরিচিত এক কোটিপতির। সবার ঘাড় থেকেই ভূত নেমে গেছে যেন স্বইচ্ছাতেই।

রহস্য কিন্তু তবু রয়েই গেছে। বাগান কেদারায় ওব্রায়েন সিমনের পাশে এসে বসতেই তিনি আবার সেই নিয়েই জল্পনা আরম্ভ করলেন। নীল ওব্রায়েনের মন তখন অন্য সুখপ্রদ চিন্তায় মগ্ন, এব্যাপারে বেশী সাড়া দিলেন না। কেবল স্পষ্টভাবে বললেন,

- আমার এই ব্যাপারে বড় একটা আগ্রহ নেই। পরিষ্কার তো বোঝাই যাচ্ছে কি হয়েছিল। ওই লোকটার ওপর ব্রেইনের কোন কারণে রাগ ছিল, তাই ভুলিয়েভালিয়ে বাগানে এনে আমার তলোয়ার দিয়ে খুন করছে। শুনেছেন বোধহয়, লাশের পকেট থেকে একখানা মার্কিন ডলার পাওয়া গেছে। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে লোকটা ব্রেইনের দেশের লোক। এতে আর প্রশ্নের কি আছে?

- পাঁচটা কঠিন প্রশ্ন আছে - মৃদুস্বরে বললেন ডঃ সিমন - যেন পাঁচিলের ভেতর পাঁচিল। আমায় ভুল বুঝবেন না। ব্রেইন যে খুন করেছে তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। তার পালানোই সেটা প্রমাণ করে। কিন্তু খুন করল কি করে? প্রথম প্রশ্ন - কেউ কাউকে একখানা বিশাল তলোয়ার দিয়ে খুন করতে যাবে কেন? একখানা ছোট ছুরি দিয়ে খুন করে তো সেটা অনায়াসে পকেটে পুরে ফেলা যায়। দ্বিতীয় প্রশ্ন - কোন আওয়াজ বা চিৎকার শোনা যায়নি কেন? কেউ যদি দেখে তাকে অন্য কেউ একখানা তলোয়ার নিয়ে তাড়া করে আসছে, সে কি চুপ করে থাকে? তৃতীয় প্রশ্ন - বাইরের দরজায় একজন খানসামা সারাক্ষণ বসেছিল, তাকে এড়িয়ে ভ্যালেন্টিনের বাগানে একটা ইঁদুরও ঢুকতে পারবে না। তবে মৃত ব্যক্তি বাগানে এল কি ভাবে? চতুর্থ প্রশ্ন - একই উপায়ে, ব্রেইন বাগান থেকে বেরোল কি করে?

- আর পঞ্চম প্রশ্ন? জিজ্ঞাসা করলেন ওব্রায়েন। চোখ তাঁর ইংরেজ পাদ্রীটির দিকে, বাগানের পথ ধরে এগিয়ে আসছেন তিনি।

- পঞ্চম প্রশ্নটা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু বেশ অদ্ভুত। বললেন ডাক্তার সিমন্ - যখন আমি কাটা মাথাটা প্রথম দেখি, তখন ভেবেছিলাম খুনী সেটা এককোপে কেটেছে। কিন্তু ভাল করে পরীক্ষা করার পর দেখলাম কাটা অংশটায় অনেকগুলো ক্ষতচিহ্ন। যেন মাথাটা কেটে ফেলার পর সেটা কোপানো হয়েছে। ব্রেইনের কি শত্রুর ওপর এত এতই রাগ ছিল যে তাকে খুন করে তারপর চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে তাকে ক্রমাগত কুপিয়েছে?

- কি ভয়ঙ্কর ! বলে শিউরে উঠলেন ওব্রায়েন।

খর্বকায় পাদ্রী ব্রাউন এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন। নিজের বিনম্র স্বভাববশতঃ কথা বলেননি দুজনের কথার মাঝখানে। এবার অপ্রতিভ ভাবে বললেন,

- ব্যাঘাত করার জন্যে মাপ করবেন। কিন্তু আপনাদের একটা খবর দিতে পাঠাল আমাকে।

- খবর ! পুনরাবৃত্তি করলেন সিমন। চশমার মধ্যে দিয়ে যেন অনেক কষ্ট করে তাকালেন পাদ্রী ব্রাউনের দিকে।

- হ্যাঁ, কিছু মনে করবেন না - হাল্কাস্বরে বললেন ফাদার ব্রাউন - কিন্তু আর একটা খুন হয়েছে।

বাগানকেদারা ছেড়ে দুজনেই একসাথে এমন লাফিয়ে উঠলেন যে দুলতে লাগলে সেটা।

- আরও অদ্ভুত ব্যাপার হল - বলে চললেন ফাদার ব্রাউন, উদাস দৃষ্টি তার বাগানের রোডেনড্রনের ওপর - ঠিক একই রকম নৃশংসভাবে মুন্ডচ্ছেদ করা হয়েছে। দ্বিতীয় কাটা মুন্ডখানা রক্তাক্ত অবস্থায় নদীতে পাওয়া গেছে - ব্রেইনের প্যারিস গমনের পথের দুচার গজের মধ্যেই। সবাই বলছে ব্রেইনই বোধ হয় ——

হা ভগবান - আর্তনাদ করে উঠলেন ওব্রায়েন - ব্রেইন কি উন্মাদ?

- আমেরিকায় প্রতিহিংসা মেটানোর প্রথা আছে - ভাবলেশহীন কণ্ঠে বললেন ফাদার ব্রাউন - সবাই আপনাদের লাইব্রেরীতে মাথাটা দেখতে ডাকছে।

পীড়িত মনে অন্যদের পশ্চাদনুসরণ করলেন ওব্রায়েন। এই ব্যাপক গুপ্তহত্যায় বিরূপ তাঁর সৈনিক মন। একের পর এক কাটা পড়ল দু দুটি মাথা। কখন থামবে এই ব্যাপক শিরচ্ছেদের পালা? লাইব্রেরী ঘরে ঢুকতে যেন আবার আচমকাই ধাক্কা খেলেন তিনি - ভ্যালেন্টিনের টেবিলে ওপর বুঝিবা পড়ে তৃতীয় একখানা রক্তলিপ্ত মাথা, আর সে মাথা খোদ ভ্যালেন্টিনের। দ্বিতীয় দৃষ্টিতে অবশ্য বোঝা যায় যে সেখানা খবরে কাগজে আঁকা ছবি। দি গিলোটিন নামক এই

দক্ষিণপন্থী সংবাদপত্রটি প্রতি সপ্তাহে তার কোন একটি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ছবি ছাপায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীর ছিন্ন শিরের আদলে। ধর্মবিদ্বেষী হওয়ার সুবাদে ভ্যালেন্টিনের ছবি ঠাঁই পেয়েছে তাই এবারের কাগজে। ওব্রায়েন মার্জিত রুচি আইরিশ। ফরাসী মনীযার এহেন পাশবিকতার প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা হল তাঁর মনে। সে পাশবিকতার চিহ্ন সংবাদপত্রের চাযাড়ে ব্যঙ্গচিত্র থেকে আরম্ভ করে গথিক চার্চের দানবমূর্তি অবধি সর্বত্র ছড়িয়ে। মনে পড়ে গেল তাঁর ফরাসী বিপ্লবের যত ক্রুর রসিকতার কাহিনী। ভ্যালেন্টিনের ওই রক্তচিত্র থেকে আরম্ভ করে রাক্ষসমূর্তির স্তূপের ওপর দাঁড়ানো নতর দামের শয়তানের প্রতিকৃতি অবধি পুরো শহরটাই বুঝিবা এক অশুভ শক্তির বিকাশ।

লাইব্রেরী ঘরখানা নিচু, লম্বাটে আর প্রায়ন্ধকার। পর্দার তলা দিয়ে আসা অল্প আলোটুকুতে তখনো সকালের রক্তিম আভাস। একখানা ঢালু ডেস্কের একপাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন ইভান সমেত ভ্যালেন্টিন। স্বল্প আলোকে বীভৎ-সদর্শন প্রত্যঙ্গগুলি পড়ে ডেস্কের ওপর। একপাশে আগের অবস্থাতেই পড়ে কালো পোযাকে ঢাকা কবন্ধ আর তার পীতাভ মুন্ডখানা। অন্য পাশে রয়েছে নদীর নলখাগড়া থেকে তুলে আনা জলসিক্ত দ্বিতীয় মুন্ডখানা। মুন্ডর কবন্ধের তল্লাসি জারি রেখেছে ভ্যালেন্টিনের লোকজন, সেটা হয়ত নদীতে ভেসে গেছে।

ফাদার ব্রাউনের মন অত সংবেদনশীল নয়, তিনি পিটপিটে চোখে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন দ্বিতীয় মুন্ডটাকে। শুভ্রকেশ মুন্ডের চুল ভিজে নুটির মত, সকালের অচঞ্চল রক্তিম আলো তাতে এনেছে রুপোলি আঁচের ছোঁয়া। কুৎসিত, কালশিটে পড়া অসাধু দেখতে মুখখানা থেঁতলে গেছে, বুঝিবা নদীর পাথর কিম্বা গাছে ঠোকর খেয়ে।

- সুপ্রভাত কমান্ডান্ট ওব্রায়েন - ধীরকণ্ঠে বেশ আন্তরিকভাবেই বললেন ভ্যালেন্টিন - ব্রেইনের সর্বশেষ জবাইটার কথা শুনেছেন বোধহয়?

শুভ্রকেশ মুন্ডটি তখনো ঝুঁকে পড়ে পরীক্ষা করছিলেন ফাদার ব্রাউন। মাথা না তুলেই বললেন,

- এ মাথাটাও যে ব্রেইনই কেটেছে সে বিষয়ে সবাই বোধহয় একরকম নিশ্চিত?

- সাধারণ বুদ্ধিতে তো তাই বলে - দুপকেটে হাত ঢুকিয়ে বললেন ভ্যালেন্টিন - খুনটা হয়েছে একই পদ্ধতিতে, আবিষ্কৃত হয়েছে প্রথমটার কয়েক গজের মধ্যে, আর ব্যবহৃত হয়েছে সেই একই অস্ত্র যা নিয়ে পালিয়েছিল খুনী।

- হ্যাঁ, হ্যাঁ জানি - বিনীতভাবে বললেন ফাদার ব্রাউন - কিন্তু আমার মনে হয় না এ মুন্ডখানা অন্তত ব্রেইন কেটে থাকতে পারবে।

- কেন নয়? প্রশ্ন করলেন ডাক্তার সিমন; চোখে তাঁর যুক্তিবাদীর দৃষ্টি।

পিটপিট করে তাকিয়ে পাদ্রীমশাই বললেন,

- আচ্ছা বলুনতো ডাক্তার, কোন মানুষের পক্ষে কি নিজের মুন্ডচ্ছেদ করা সম্ভব? আমার তো অন্তত সেরকম জানা নেই।

ওব্রায়েনের মনে হলে যেন উন্মাদ জগৎ ব্রহ্মান্ড তাঁর চারপাশে ধুলিস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে। বাস্তববুদ্ধি ডাক্তার সিমন কিন্তু একলাফে এগিয়ে এসে সরিয়ে ফেললেন সাদা চুলের গোছা।

- ইনিই যে ব্রেইন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই - ধীর গলায় বললেন ফাদার ব্রাউন - ব্রেইনের বাঁ কানেও ঠিক ওই কাটা খোঁচাটুকু ছিল।

পাদ্রীর দিকে স্থির জ্বলন্ত দৃষ্টি নিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে এতক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন গোয়েন্দা ভ্যালেন্টিন। এবারে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন,

- ব্রেইনের সমন্ধে আপনি অনেক কিছুই জানেন দেখছি ফাদার ব্রাউন !

- তা জানি বইকি - বিনীতভাবে বললেন খর্বকায় পাদ্রীমশাই - কয়েক সপ্তাহ ছিলাম ওনার সঙ্গে। উনি আমাদের চার্চে যোগ দেবার কথা ভাবছিলেন কিনা।

ভ্যালেন্টিনের দুচোখে ধ্বক করে জ্বলে উঠল তাঁর অনুদার মনোভাবের আগুন। ঘুষি পাকিয়ে লম্বা পায়ে এগিয়ে এলেন পাদ্রী ব্রাউনের দিকে। শ্লেষপূর্ণ স্বরে বললেন,

- আর বোধহয় ওনার সব টাকাপয়সাও আপনাদের চার্চে দান করার কথা ভাবছিলেন, তাই না?

- হয়ত ভাবছিলেন - অবিচলিতভাবে বললেন ফাদার ব্রাউন - ভাবা খুবই সম্ভব।

হিংস্র হাসি ফুটে উঠল ভ্যালেন্টিনের মুখে। চড়া গলায় বললেন,

- তাহলে তো ব্রেইন সমন্ধে আপনার অনেক কিছুই জানার কথা। ব্রেইনের জীবন সমন্ধে, এমনকি হয়ত তাঁর ————

ভ্যালেন্টিনের কাঁধে হাত রাখলেন কমান্ডান্ট ওব্রায়েন। বললেন,

- এসব অনর্থক মিথ্যা দোষারোপ বন্ধ করুন ভ্যালেন্টিন। তা নাহলে কিন্তু আবার তলোয়ার চলা আরম্ভ হয়ে যেতে পারে।

পাদ্রী ব্রাউনের বিনীত অথচ স্থির দৃষ্টিতে ফিরে এসেছিল ভ্যালেন্টিনের সম্বিত। চুপ করে থেকে বললেন,

- কারো ব্যক্তিগত মত প্রকাশের সময় এটা নয়। যাই হোক আপনারা এখান ছেড়ে না যাবার কথা দিয়েছেন, দয়া করে সে কথা রাখবেন, আর দেখবেন যেন অন্যরাও রাখেন।আপনাদের আরো কিছু জানার থাকলে ইভানই আপনাদের জানাবে। আমাকে এইবার গোটা ব্যাপারটা লিখিতভাবে কতৃপক্ষকে জানাতে হবে, এটাকে আর চাপা দিয়ে রাখা যাবে না। যদি আর নতুন কিছু খবর আমায় দিতে চান, তাহলে আমাকে পড়ার ঘরে পাবেন।

সটান বেরিয়ে গেলনে ঘর থেকে পুলিশকর্তা।

- আরো কিছু খবর আছে নাকি ইভান? প্রশ্ন করলেন ডক্টর সিমন।

কুঁচকে গেল ইভানের স্থবির পাংশুবর্ণ মুখখানা। বলল,

- আর একটা খবর আছে বইকি হুজুর, বেশ জরুরী খবর। ওই যে বিটকেলতা বাগানে পাওয়া গেছে না - অভদ্রভাবে কালো পোষাকে ঢাকা কবন্ধ আর তার পীতাভ মুন্ডখানা দেখাল ইভান - ও যে কে তা জানা গেছে।

- তাই নাকি! বিস্ময়োক্তি করলেন ডাক্তার সিমন - কে লোকটা?

- ওর নাম আর্নল্ড বেকার - বলল গোয়েন্দা সাগরেদ ইভান - যদিও ওর আরো বহু ছদ্মনাম আছে। ব্যাটা ভবঘুরে বদমাস, আমেরিকাতেও নাকি গিয়েছিল।

সেখানেই বোধহয় ব্রেইনের সঙ্গে ঝামেলার সূত্রপাত। এর কর্মক্ষেত্র জার্মানী হওয়াতে আমাদের সাথে বড় একটা আদানপ্রদান ছিল না। জার্মান পুলিশকে তাই খবর দিয়েছি আমরা। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হল, যে এর যমজ ভাই লুই বেকারের সাথে আমাদের মেলামেশা ছিল যথেষ্ট। এইতো গতকালই আমাদের তাকে গিলোটিনে চড়াতে হয়েছে। সত্যি বলতে কি মশাইরা, ওটাকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে পিলে চমকে উঠেছিল আমার। নিজের চোখে যদি না লুই বেকারকে গিলোটিনে চড়তে দেখতাম তাহলে হলফ করে বলতাম যে ওটা ঘাসের ওপর লুই বেকারই পড়ে আছে। তারপর মনে পড়ল লুই বেকারের জার্মানীতে একজন যমজ ভাই আছে। তারপর সেই সূত্র ধরে ——————

মাঝপথে থামতে বাধ্য হল ইভান, কারণ তার কথায় কারোরই খেয়াল নেই। কমান্ডান্ট আর ডাক্তার দুজনেই অপলক দৃষ্টিতে ফাদার ব্রাউনের দিকে। তিনি লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন, আর চেপে ধরেছেন কপালের রগ, যেন পেয়েছেন অসহ্য যন্ত্রণা।

- দাঁড়ান, দাঁড়ান - চেচিয়ে উঠলেন তিনি - এক মিনিট চুপ করুন। মোটে আধখানা দেখতে পাচ্ছি আমি। ইশ্বর কি আমায় শক্তি দেবেন ? পুরোটা কি দেখতে পাব আমি ? সাহায্য কর প্রভু। মেধা তো আমার দুর্বল নয়। এক সময়ে তো আকুইনিয়াসের যে কোন পাতার ওপর টিকা লিখতে পারতাম আমি ! আমার মাথাটা কি চৌচির হয়ে যাবে, নাকি আমি দেখতে পারব ? অর্ধেকটা মোটে অর্ধেকটা দেখতে পাচ্ছি আমি !

দুহাতে মুখ ঢেকে স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে রইলেন ফাদার ব্রাউন। বুঝিবা প্রার্থনা কিম্বা চিন্তায় রত। আর উত্তেজনাপূর্ণ গত বারো ঘন্টার এই সর্বশেষ অদ্ভুত আচরণটির দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন বাকি তিনজন।

অবশেষে মুখ থেকে হাত সরালেন ফাদার ব্রাউন। মুখে তাঁর শিশুর সতেজ প্রশান্তি। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন,

- যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ব্যাপারটা চটপট মিটিয়ে ফেলা যাক। দেখি তাড়াতাড়ি কি করে আপনাদের সত্য বোঝানো যায়।

ডক্টর সিমনের দিকে ফিরলেন ফাদার ব্রাউন। বললেন,

- ডক্টর সিমন, আপনার মাথা তো খুব ভালো, সকালে আপনি এই প্রহেলিকা সমন্ধে পাঁচটা কঠিন প্রশ্ন তুলেছিলেন না? সে প্রশ্নগুলো যদি আর একবার করেন তাহলে আমি তাদের উত্তর দিতে পারি।

যুগপৎ বিস্ময়ে এবং সংশয়ে খসে গেল ডক্টর সিমনের নাকের ডগার চশমা। কিন্তু তবু সাথে সাথে বললেন,

- প্রথম প্রশ্ন হল যে যখন একখানা ছোট গুণসূঁচ দিয়েই খুন করা যায়, তখন কেউ একটা ধূমসো তলোয়ার ব্যবহার করতে যাবে কেন?

- কারণ গুণসূঁচ দিয়ে কারোর গর্দান নেওয়া যায় না - শান্তকণ্ঠে বললেন ফাদার ব্রাউন - আর এই খুনটার জন্যে মুন্ডচ্ছেদ ছিল একান্ত আবশ্যক।

- কিন্তু কেন? প্রশ্ন করলেন কৌতূহলী ওব্রায়েন।

- আপনার পরের প্রশ্ন? বললেন ফাদার ব্রাউন

- লোকটা কোন চিৎকার বা শব্দ করেনি কেন? প্রশ্ন করলেন ডাক্তার সিমন - তলোয়ার তো আর সচরাচর বাগানে দেখতে পাওয়া যায় না!

- ডালপালার কুঁচি! বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন ফাদার ব্রাউন। জানলা দিয়ে তাকালেন বাগানের সেই মৃত্যু মঞ্চের দিকে - ভাঙা ডালপালাগুলোর মর্ম আপনারা কেউ বুঝতে পারেন্নি! গাছ থেকে অতদূরে কেন পড়ে ওগুলো? ভাঙা হয়নি ডালগুলো, কাটা হয়েছে। খুনী বোধহয় তার শত্রুকে কিছু তলোয়ারর কসরৎ দেখাচ্ছিল, যেমন এক কোপে কি করে গাছের ডাল কাটা যায়, বা ওই ধরণের কিছু। তারপর তার শিকার যখন নিচু হয়ে সেটা দেখতে গেছে, নেমে এসেছে তলোয়ারের নি:শব্দ এক কোপ, ধড় থেকে আলাদা হয়ে গেছে মুন্ড।

- আপনার যুক্তি তো আপাতদৃষ্টিতে ঠিকই মনে হচ্ছে - ধীরে ধীরে বললেন ডক্টর সিমন - কিন্তু আমার পরের দুটো প্রশ্ন যে কারোর মাথা ঘামিয়ে দেবে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন পাদ্রীমশাই।

- চতুর্দিক আঁটা নিশ্চিদ্র বাগানখানা তো দেখেছেন - বলে চললেন ডক্টর সিমন - অচেনা আগন্তুক বাগানে পৌছল কি ভাবে?

মাথা না ঘুরিয়েই উত্তর দিলেন ফাদার ব্রাউন,

- বাগানে কোন অচেনা লোক ছিল না।

নেমে এল ক্ষণিকের জমাট নিস্তব্ধতা, আর তার পরেই বিটকেল হাসির আওয়াজ। ফাদার ব্রাউনের এই অদ্ভুত যুক্তিতে বিদ্রূপ করার সুযোগ পেয়েছে ইভান,

- ও! তাহলে কাল রাতে বোধহয় আমরা বাগান থেকে দামড়া একটা লাস তুলে এনে সোফায় রাখিনি? বলল ইভান - লোকটা বোধকরি বাগানে যায়নি?

- বাগানে? অন্যমনস্কভাবে বললেন ফাদার ব্রাউন - না, পুরোটা যায়নি।

- দাঁড়ান মশাই! চেঁচিয়ে উঠলেন সিমন- লোকটা বাগানে গিয়েছিল কিম্বা যায়নি।

- তার কোন মানে নেই - মৃদু হেসে বললেন ফাদার ব্রাউন - আপনার পরের প্রশ্নটা কি ডাক্তার?

- আমার মনে হয় আপনি বোধহয় অসুস্থ - রূঢ়কণ্ঠে বললেন ডক্টর সিমন - কিন্তু তবু বলছি আমার পরের প্রশ্ন। ব্রেইন বাগান থেকে বেরোলো কি করে?

- বাগান থেকে বেরোয়নি - বললেন পাদ্রী মশাই। দৃষ্টি তখনো তাঁর জানলা ছাড়িয়ে বাইরের দিকে।

- বাগান থেকে বেরোয়নি? ফেটে পড়লেন সিমন।

- পুরোপুরি না, বললেন ফাদার ব্রাউন।

রেগে ঘুষি পাকালেন ফরাসী যুক্তিবাদী সিমন। বললেন,

- একটা লোক হয় বাগানে ছিল কিম্বা ছিল না।

- তার কোন মানে নেই, বললেন ফাদার ব্রাউন।

সহ্য করতে না পেরে তেড়ে লাফিয়ে উঠলেন ডক্টর সিমন। রোষের সঙ্গে বললেন,

- এই রকম কথায় আমি আর সময় নষ্ট করতে চাই না। একটা লোক পাঁচিলের এপাশে ছিল না অন্যপাশে, সে কথাও যদি আপনি বুঝতে না পারেন তাহলে আপনার সঙ্গে কথা বাড়িয়ে আর লাভ নেই।

- ডাক্তার - কোমল কণ্ঠে বললেন ফাদার ব্রাউন - আমরা চিরকাল সুসম্পর্ক বজায় রেখেছি। আর কিছু না হোক অন্তত পুরনো বন্ধুত্বের খাতিরে আপনার পঞ্চম প্রশ্নটা করুন।

দরজার পাশে একটা চেয়ারে অধৈর্যভাবে বসে পড়লেন ডক্টর সিমন। বললেন,

- কাঁধ আর মাথা অদ্ভুতভাবে কোপানো। যেন মৃত্যুর পর করা হয়েছে।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে উত্তর দিলেন পাদ্রীমশাই,

- হ্যাঁ। যে প্রবঞ্চনাটাকে আপনারা সবাই সত্যি বলে ঠাউরেছেন, সেটা আপনাদের মাথায় ঢোকানোর জন্যে করা হয়েছে ওটা। করা হয়েছে যাতে আপনারা নির্বিচারে মেনে নেন যে মাথাটা কবন্ধটারই।

বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে গেল ওব্রায়েনের। মগজের গোপন রন্ধ্রথেকে মৎসকন্যা আর অশ্বমানবের মত যত অলীক অপদেবতার কল্পনা ছাড়া পেল চিন্তার স্রোতে। কোন প্রাচীন যুগের দৈববাণী যেন কানে কানে বলল - ওহে যেওনা ওই সর্বনেশে বাগানে, যেখানে আছে জোড়া ফলের গাছ। পরিহার কর ওই অশুভ উদ্যান যেখানে পঞ্চত্ব পায় যুগ্ম শির মানব। অবশ্য তাঁর আইরিশ মনের মুকুরে এই সব অলীক ছায়াছবির খেলা চললেও ফরাসী রঙ লাগা তাঁর মেধা কিন্তু অতি সতর্ক। অন্যদের মতই সন্দিগ্ধভাবে লক্ষ্য করছিলেন পাদ্রীমশাইকে।

অবশেষে জানলার দিকে পিঠ করে ঘুরে দাঁড়ালেন ফাদার ব্রাউন। ঘন ছায়াতেও চোখে পড়ে ছাইয়ের মত সাদা তাঁর মুখখানা। কিন্তু কথা বললেন তিনি দ্বিধাহীনভাবে,

- মশাইরা, আপনারা বাগানে অচেনা কোন বেকারের লাস পাননি। সত্যি বলতে কি আপনারা কোন লাসই পাননি। ডাক্তার সিমনের তর্কের উত্তরে আমি ফের বলছি, বেকার পুরোপুরি এখানে উপস্থিত ছিল না। দেখুন - কালো পোষাকে মোড়া লাসের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করলেন ফাদার ব্রাউন - ও লোকটাকে তো

জীবনে দেখেননি আপনারা। কিন্তু এ লোকটাকে দেখেছেন কি?

আগন্তুকের বিরলকেশ পীতাভ মুন্ডটা একপাশে গড়িয়ে সরিয়ে দিলেন ফাদার ব্রাউন। আর তার জায়গায় বসিয়ে দিলেন শ্বেতকেশ দ্বিতীয় মুন্ডটা। সবাই বিস্ময়ে দেখলেন পড়ে রয়েছে জুলিয়াস কে ব্রেইনের সম্পূর্ণ দেহাবয়ব।

- খুনী তার শত্রুর মুন্ডচ্ছেদ করে তলোয়ারখানা পাঁচিল টপকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় - ধীরভাবে বললেন ফাদার ব্রাউন - কিন্তু শুধু তলোয়ারখানা ফেলার মত বোকা সে নয়। মুন্ডটাও সে ছুঁড়ে ফেলে পাঁচিলের ওপাশে। তারপর আর কি, অন্য একটা মুন্ড লাসের সঙ্গে জোড়া দেওয়া, আর আপনারা সবাই ভাবলেন খুন হয়েছে কোন অচেনা লোক।

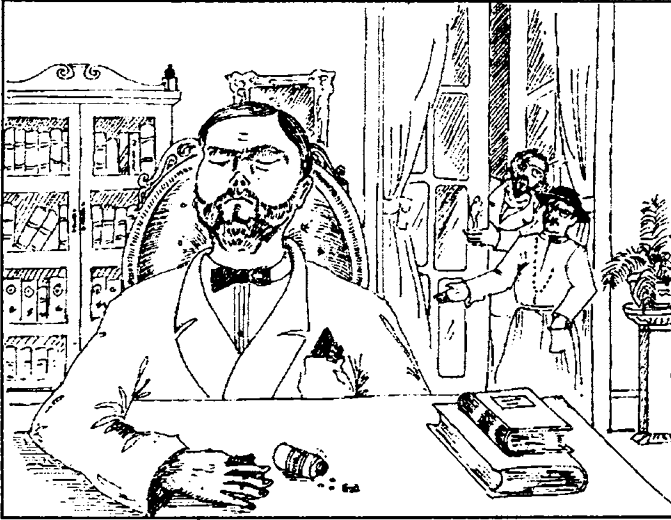
- আর একটা মুন্ড জোড়া দেওয়া! বিস্ফারিত নয়নে বললেন ওব্রায়েন আর একটা মুন্ড আসবে কোথা থেকে? মুন্ড কি গাছে হয়?

- না - মাটির দিকে তাকিয়ে ধরা গলায় বললেন ফাদার ব্রাউন - কিন্তু গিলোটিনের ঝুড়িতে হয়। যে গিলোটিনের পাশে পুলিশকর্তা অ্যারিস্টিড ভ্যালেন্টিন এখানে আসার খানিক আগেই ছিলেন দাঁড়িয়ে। দাঁড়ান, দাঁড়ান মশাইরা, এক মিনিট আমার কথাটা শুনে নিন, তারপরে না হয় আমায় ঠ্যাঙাবেন। ভ্যালেন্টিন সৎ, কিন্তু নিজের মতের ব্যাপারে উন্মাদ। ওনার শীতল ধূসর চাহনি দেখে কি বুঝতে পারেননি আপনারা? উনি যাকে খ্রীষ্টিয় কুসংস্কার মনে করেন, সেই বিশ্বাস ভাঙার জন্যে কোন কাজেই পিছপা নন উনি। ওনার এই মতের খাতিরে উনি লড়াই করছেন, উপোস করছেন আর এবার খুন করলেন। ব্রেইন এর আগে ছোটখাট সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে পয়সা ছড়িয়েছেন, তাতে বড় একটা কিছু পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু ভ্যালেন্টিন একটা গুজব শুনছিলেন যে কল্পনাবিলাসী ব্রেইন নাকি ধীরে ধীরে আমাদের দিকে ঝুঁকছেন। এটা সত্যি হলে অবস্থা পুরোপুরি পাল্টে যাবার সম্ভাবনা; ব্রেইন তাঁর অগাধ সম্পত্তি ঢালবেন ফ্রান্সের চার্চের শূন্য ভান্ডারে, তাঁর পয়সায় চলবে দি গিলোটিনের মত আরো ছ-ছখানা দক্ষিণপন্থী সংবাদপত্র। সমতা পাল্টে যাবার এই বিপদে ক্ষেপে উঠলেন ভ্যালেন্টিন। ঠিক করলেন দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবেন ব্রেইনকে। গোয়েন্দা শ্রেষ্ঠ তাঁর প্রথম অপরাধ করলেন নিপুনভাবে। কোন একটা কাজের অজুহাতে বেকারের মাথাটা বের করে বাক্স ভরে বাড়ি নিয়ে এলেন। ব্রেইনের সঙ্গে শেষবারের মত তর্কাতর্কি

করলেন, যার শেষ অসফল অংশটুকু ছাড়া বাকিটা শুনলেন লর্ড গ্যালওয়ে। তারপর তাকে নিজের নিশ্ছিদ্র বাগানে নিয়ে এলেন, তলোয়ারবাজীর গল্প করলেন, তলোয়ার দিয়ে গাছের ডাল কেটে দেখালেন, তারপর ————————

- পাগল কোথাকার! চেঁচিয়ে লাফিয়ে উঠল জখমি ইভান - এক্ষুণি চল হুজুরের কাছে! না হলে তোমাকে আমি ——————

- ওনার কাছেই যাচ্ছিলাম আমি - বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন ফাদার ব্রাউন - ওনার স্বীকারোক্তি শুনতে হবে আমায়।



হুড়মুড় করে ঢুকলেন ভ্যালেন্টিনের নিস্তব্ধ পড়ার ঘরে

ফাদার ব্রাউনকে প্রায় বলির পাঁঠার মতই ঠেলতে ঠেলতে সবাই হুড়মুড় করে ঢুকলেন ভ্যালেন্টিনের নিস্তব্ধ পড়ার ঘরে।

ডেস্কে বসা গোয়েন্দাপ্রবর বুঝিবা নিজের কাজে এত ব্যস্ত যে এই বিক্ষুব্ধ আগমনও শুনতে পেলেন না। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলেন সবাই। তারপর তাঁর সটান পিঠের দিকে তাকিয়ে কি সন্দেহ হওয়াতে ছুটে গেলেন ডাক্তার সিমন। নজরে পড়ল ভ্যালেন্টিনের হাতের কাছে ওযুধের বড়ির কৌটো। গায়ে হাত দিয়ে বুঝলেন ভ্যালেন্টিন মৃত - আত্মহননের চিহ্ন ছাপিয়ে গর্বের দীপ্তি পরিস্ফুট তাঁর মুখে।

পদসঞ্চারের প্রহেলিকা

'দ্বাদশ যথার্থ ধীবর' নামক অভিজাত ক্লাবটির বাৎসরিক ডিনার উপলক্ষে তার কোন সদস্যের সঙ্গে ভার্নন হোটেলে মুখে যদি আপনার দেখা হয়, তাহলে তাঁর ওভারকোট খোলার সময়ে দেখতে পাবেন তাঁর পরণের সান্ধ্য কোটখানা কালো নয়, সবুজ। যদি কোনমতে তাঁকে সাহস করে কারণ জিজ্ঞেস করার মতিভ্রম আপনার হয়ও, তাহলে শুধু উত্তর পাবেন যে যাতে লোকে তাঁকে বেয়ারা বলে ভুল না করে, তাই এই আয়োজন। ব্যথিত হৃদয়ে আপনি তখন বিদায় নেবেন। কিন্তু পেছনে ফেলে যাবেন অমীমাংসীত এক রহস্য আর অশ্রুত এক কাহিনী।

ধরুন ফাদার ব্রাউন নামে একটি শান্তপ্রকৃতি, নিরলস, খর্বকায় পাদ্রীর সঙ্গে আপনার যদি কখনো মোলাকাত হয়, আর তাঁর কাছে যদি আপনি জানতে চান তাঁর জীবনের ভাগ্যচক্রের শ্রেষ্ঠ দিন কোনটা, তিনি খুব সম্ভবতঃ বলবেন যে তাঁর পরম সৌভাগ্যের দিনটি এসেছিল ভার্নন হোটেলে। সেদিন তিনি স্রেফ প্যাসেজে কয়েকটা পদশব্দ শুনে শুধু একটা অপরাধই আটকাননি, হিতসাধনও করছিলেন একটি মানবআত্মার। নিজের সেই বিস্ময়কর কষ্টকল্পিত অনুমান সম্বন্ধে অল্প আত্মগরিমাও আছে তাঁর। আপনাকে তাই শোনালেও শোনাতে পারেন সে গল্প। কিন্তু সমাজের উচ্চতম ধাপে উঠে দ্বাদশ যথার্থ ধীবরদের কাউকে পাওয়া বা সমাজের নিম্নতম ধাপে পৌঁছে বস্তি আর বদমায়েশদের মধ্যে থেকে ফাদার ব্রাউনকে খুঁজে বের করা, দুই-ই যখন আপনার পক্ষে খুব একটা সম্ভব নয়, তখন আমার কাছ থেকেই আপনাদের শুনতে হবে সে কাহিনী।

দ্বাদশ যথার্থ ধীবরের বাৎসরিক ডিনার হত ভার্নন হোটেলেই। এই ধরণের প্রতিষ্ঠান পাবেন শুধুমাত্র তাই সমস্ত ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজে, যেখানে ভব্য আদবকায়দার চলন গিয়ে পৌঁচেছে পাগলামির পর্যায়ে। 'অভিজাত' হওয়ার সুবাদে কাজের ধারাই বিপরীত এই বাণিজ্যিক সংস্থাটির। ব্যবসা করে খদ্দের ডেকে নয়, খদ্দের বিদেয় করে। অভিজাততন্ত্রের এমনই ধারা, যে চতুর ব্যবসায়ীরা হয়ে থাকেন তাঁদের মক্কেলদের থেকেও অধিকমাত্রায় রুচিবাগীশ। ইচ্ছাকৃত ভাবে খাড়া করেন এমন সব প্রতিবন্ধক যা অতিক্রম করতে অর্থ এবং কূটকৌশল দুই-ই ব্যবহার করতে পিছপা হননা তাঁদের বিত্তশালী গ্রাহকের দল। যেমন ধরুন লণ্ডনে যদি কোন কেতাদুরস্ত হোটেল থাকে যেখানে ছফুটের চেয়ে খাটো লোকের

প্রবেশ নিষেধ, দেখবেন সেখানে ডিনার করার জন্যে সমাজে বিনা প্রতিবাদে তৈরি হয়েছে ছফুট লোকেদের দল। কিম্বা যদি কোন অভিজাত রেস্তোঁরার মালিক নিয়ম করেন যে তিনি শুধুমাত্র বৃহস্পতিবার রেস্তোঁরা খোলা রাখবেন, তাহলে দেখবেন বৃহস্পতিবার রেস্তেঁরার বাইরে লোকে লোকারণ্য। ভার্নন হোটেলটা তো একে ছোট, তারপরে তার আবার কয়েকটা অসুবিধেও ছিল। কিন্তু হলে কি হবে, কিছু লোকের কাছে সেই অসুবিধেগুলোই তাদের শ্রেণীর চারপাশের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর। সবচেয়ে বিরাট অসুবিধে হল হোটেলে একসাথে চব্বিশটার বেশী লোকের খাবার জায়গা নেই। তারওপর আবার ছাতের টেবিল বলে সবচেয়ে বড় যে টেবিলখানা আছে সেটা পাতা একটা খোলা বারান্দার মত জায়গায়, যার নিচেই লণ্ডনের একখানা সেরা সাজানো বাগান। অর্থাৎ এ টেবিলে চব্বিশজনের আসন পাতা সম্ভব শুধু গরমকালের পরিষ্কার আবহাওয়াতেই। এতে আরো অসুবিধের সৃষ্টি হয়েছে এ হোটেলে খানাপিনা করার পক্ষে, এবং ঠিক সেই কারণেই বাড়িয়ে তুলেছে হোটেলের চাহিদা। হোটেলের মালিক লিভার নামে এক ইহুদী, এবং হোটেলে ঢোকা এতভাবে মুস্কিল করে রেখে, হোটেলের আয়ে আজ তিনি কোটিপতি। অবশ্য এই সব প্রতিবন্ধই সব নয়, এর সাথে সাথে হোটেলের প্রতিটি কাজেই এনেছেন তিনি উৎকর্ষতার পালিশ। ইউরোপের সবসেরা খাদ্যপানীয় তো পাবেনই এখানে, পরিচারকদের আদবকায়দাতেও পাবেন ইংরেজ অভিজাত সম্প্রদায়ের বনেদী মেজাজের ছাপ। পনেরোজন পরিচারকের প্রত্যেককে নিজের আঙুলের থেকেও নিবিড়ভাবে চেনেন মালিক। আর সত্যি বলতে কি, এ হোটেলের পরিচারক হবার চেয়ে বরং পার্লামেন্টের সাংসদ হওয়া সহজ। বড়মানুষের খাস খানসামার মতই নীরব সাবলীলতায় কাজ করতে অভ্যস্ত প্রত্যেকটি পরিচারক, এবং সাধারণতঃ প্রত্যেক অতিথির জন্যে বহাল থাকে আলাদা এক একজন।

বিলাসবহুল নির্জনতার প্রতি প্রবল পক্ষপাত দ্বাদশ যথার্থ ধীবর ক্লাবের। একই বাড়িতে তাঁরা ছাড়া অন্য কোন ক্লাবও খানাপিনা করবে এ চিন্তা কল্পনাতে আনতে প্যারেন না তাঁরা। সুতরাং এহেন হোটেল ছাড়া আর কোথাও ডিনার করেন না তাঁরা। বাৎসরিক ডিনারের দিন সাজিয়ে ফেলেন ক্লাবের যত মহামূল্য সম্বল, যেন নিজেদেরই বাড়ি। এদের মধ্যে রয়েছে ক্লাবের প্রতীক সেই বিখ্যাত মাছের ছুরিচামচ-মাছের আদলে রুপো দিয়ে অপূর্বভাবে গড়া প্রতিটি, প্রতিটির হাতলে বসানো এক-একটি করে বৃহদাকার মুক্তো। টেবিলে পাড়া হয় রাজসিক



ক্লাবের প্রতীক সেই বিখ্যাত মাছের ছুরিচামচ।

আহারের মধ্যমণি মাছের পদটির সময়। এ ক্লাবের ছিল নানা বিধিনিয়ম আর আচার অনুষ্ঠান- কিন্তু না ছিল কোন মহৎ উদ্দেশ্য আর না ছিল কোন ইতিহাস। তাই তো এত অভিজাত ক্লাবটি।

দ্বাদশ ধীবর হতে গেলে অন্য কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। আপনাকে শুধু বিশেষ এক ধরণের ব্যক্তি হতে হবে। তা যদি না হন তাহলে এঁদের অস্তিত্বটুকুও টের পাবেন না আপনি। বারো বছর ধরে চলেছে এই ক্লাব। এর প্রেসিডেন্ট মিঃ অডলে। ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিউক অফ চেস্টার।

এই হোটেলের রকমসকম যদি বুঝতে পেরে থাকেন তাহলে হয়ত ভাবছেন যে এত কথা আমি জানলাম কি করে। এও হয়ত ভাবছেন যে আমার বন্ধু ফাদার ব্রাউনের মত অতি সাধারণ ব্যক্তি এহেন স্বর্ণপুরীতে পৌঁছলেন কি করে। নেপথ্যের কাহিনী অত্যন্ত সরল, নিতান্তই মামুলী।

মৃত্যুর গতি অবাধ। মানুষে মানুষে প্রভেদ ঘোচাতে হানা দেয় সবসেরা সুন্দর আবাসেও। পাণ্ডুর ঘোড়ায় সওয়ার এই সাম্যবাদী যেখানেই হাজির হয়, পেশার খাতিরে তার অনুগমন করে সেখানে পৌঁছাতে হয় ফাদার ব্রাউনকেও।

সেদিন বিকেলে একজন পরিচারক, জাতে ইতালীয়, হঠাৎই মরণাপন্ন হয়ে পড়ে স্ট্রোকে। ইহুদী মালিক, এসব ব্যাপারকে যতই কুসংস্কার মনে করুন, তার অনুরোধে ক্যাথলিক পাদ্রী ডাকতে পাঠান। মৃত্যুর আগে পরিচারকটি তাঁর কাছে কি স্বীকারোক্তি করেছিল, তা স্বাভাবিক কারণেই গোপন রেখেছেন ফাদার ব্রাউন। কিন্তু সম্ভবতঃ সে কোন খবর পাঠানোর জন্যে বা কোন অন্যায়ের প্রতিকার করার জন্যে তাঁকে একখানা চিঠি লিখে দিতে বলে। ফাদার ব্রাউন, বাকিংহাম প্রাসাদ হলেও যেভাবে করতেন, ঠিক সেইরকমই বিনীত ভাবে বেহায়ার মত লেখার কাগজপত্র আর একখানা ঘর চেয়ে বসলেন। দ্বিধায় পড়লেন মিঃ লিভার - তিনি দয়ালু লোক বটে, কিন্তু ঝঞ্ঝাট ঝামেলা পছন্দ করেন না। এদিকে আবার তাঁর সোনারচাঁদ হোটেলের কালিমাস্বরূপ এই আগন্তুকটিকে তাড়াতাড়ি বিদেয় না করলেও নয়। ভার্নন হোটেলের কোন আনাচ কানাচ বা গোপন কুঠরি নেই, লোকের অপেক্ষা করার জন্য কোন হলঘর নেই, হঠাৎ আসা কোন অতিথি নেই। আছে স্রেফ পনেরোটি পরিচারক এবং বারোটি অতিথি। এখানে ফাদার ব্রাউনকে হোটেলের অতিথি বলে চালানো একেবারেই অসম্ভব। তারওপর পাদ্রীমশায়ের ছাপোষা চেহারা আর ময়লা বেশভূষা ক্লাবের সদস্যদের যদি চোখে পড়ে, তাহলে কেলেঙ্কারীর একশেষ হবে। অনেক ভেবে চিন্তে লিভার মশাই শাক দিয়ে মাছ ঢাকার একটা ফন্দী বের করলেন।

ভার্নন হোটেলে যদি কখনো ঢোকার সুযোগ পান, তাহলে প্রথমে পাবেন একটা ছোট প্যাসেজ, তার দেওয়ালে টাঙানো হোমরাচোমরাদের ধূলোমাখা ছবি। এর শেষ প্রান্তে পাবেন হোটেলের লাউঞ্জ, যার ডানদিকে একটা প্যাসেজ গেছে হোটেলের ঘরগুলোর দিকে, আর বাঁদিকে একটা প্যাসেজ গেছে রান্নাঘর আর অফিসঘরের দিকে। বাঁদিকের প্যাসেজের শুরুতেই লাউঞ্জের গায়ে গায়ে লাগানো একটা কাঁচের অফিসঘর - যেন ঘরের মধ্যে ঘর। এখানে অতীতের কোন কালে সম্ভবতঃ হোটেলের বার ছিল, এখন সাধারণতঃ মালিকের কোন কর্মচারী বসেন। অফিসের একটু পরেই, ভৃত্যমহলে যাবার পথে পুরুষ অতিথিদের ক্লোকরুম, অতিথিদের যাতায়াতের শেষ সীমানা। অফিস আর ক্লোকরুমের মাঝে একখানা ছোট্ট ঘর, যার প্যাসেজের দিকে কোন দরজা নেই। এঘরে মালিক সারেন যত গোপন জরুরী কাজ। কোন ডিউককে হয়ত কখনো ধার দিয়ে দিলেন হাজার খানেক পাউণ্ড, আবার কখনো হয়ত বিদায় করলেন কর্পদকটি পর্যন্ত না দিয়ে।

মিঃ লিভার নিঃসন্দেহে মহৎ হৃদয় ব্যক্তি, একটি অতিসাধারণ পাদ্রীকে তাঁর এই পবিত্র ধাম আধঘন্টার জন্যে কলুষিত করার অনুমতি দিলেন, যাতে সে তার চিঠিখানা লেখার সুযোগ পায়।

কে জানে, হয়ত বা ফাদার ব্রাউন কাগজে আমার এ কাহিনীর থেকে উৎকৃষ্ট কিছু লিখেছিলেন, কিন্তু তা আর আমাদের জানার কোন উপায় নেই। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি যে তা ছিল আমার এ কাহিনীর মতই সুদীর্ঘ, আর তার শেষের অংশটুকু মোটেই ছিল না আকর্ষণীয় বা আনন্দদায়ক।

এই শেষটুকু লেখার সময়ে তাই কেমন অসংলগ্ন হয়ে এসেছিল ফাদার ব্রাউনের চিন্তার স্রোত। ধীরে ধীরে জাগ্রত হচ্ছিল তাঁর ধারালো ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়টি। ঘনিয়ে আসছে নিশা আর ডিনারের সময়। তাঁর ছোট্ট কুঠরীতে কোন আলোর ব্যবস্থা নেই। আর সেই ম্রিয়মান আলোর দরুণই হয়ত তাঁর শ্রবণ শক্তি বোধহয় বেশী সজাগ হয়ে পড়েছিল। লিখতে লিখতে তাই বোধহয় তিনি খেয়াল করলেন যে তিনি বাইরের কোন একটা শব্দের তালে তালে লিখছেন, যেমন অনেক সময় লোকে রেলগাড়ির আওয়াজের তালে তালে চিন্তা করে। ব্যাপারটা উপলব্ধি করার পর মন দিয়ে শুনে বুঝলেন যে আওয়াজটা পদশব্দ - ঘরের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে কেউ। কোন হোটেলের পক্ষে অত্যন্ত মামুলী ব্যাপার, কিন্তু তবুও ঘরের প্রায়ান্ধকার ছাদের দিকে তাকিয়ে মন দিয়ে আওয়াজটা শুনতে লাগলেন তিনি। কয়েক মুহূর্ত শোনার পর দাঁড়িয়ে উঠে একপাশে ঘাড় কাত করে ফের শুনতে লাগলেন গভীর মনোযোগ দিয়ে। তারপর ফের পড়লেন বসে, আর দুহাতে মুখ ঢেকে শুনতে শুনতে কি যেন ভাবতে লাগলেন।

বাইরের পায়ের শব্দটুকু একমুহূর্ত শুনলে যে কোন হোটেলের পায়ের আওয়াজের থেকে আলাদা বলে মনে হবে না। কিন্তু পুরোটা শোনার পর কেমন যেন অদ্ভুত লাগতে বাধ্য। আর কোন পায়ের আওয়াজ নেই, সাধারণতঃ নীরব নিস্তব্ধই থাকে এই হোটেলটা। যে কয়েকজন অল্পসংখ্যক অতিথি আসেন তারা সটান চলে যান নিজেদের ঘরে। সুশিক্ষিত বেয়ারারা ডাক না পড়া পর্যন্ত থাকে অন্তরালে অদৃশ্য। সাধারণতঃ এ ধরণের হোটেলে পায়ের আওয়াজে অস্বাভাবিক মনে হবার কোন কারণ নেই। কিন্তু এ আওয়াজটা এমনি অদ্ভুত যে মনে প্রশ্ন না উঠে পারে না। টেবিলের ধারে আঙুল রেখে মন দিয়ে আওয়াজটা শুনতে লাগলেন

ফাদার ব্রাউন, যেন পিয়ানোয় সুর মেলাচ্ছেন। প্রথমে খানিক্ষণ লঘু পায়ে দ্রুত পদচারণার অবিরাম শব্দ - যেন হাঁটার প্রতিযোগিতা চলছে। খানিক্ষণ বাদে এটা থেকে শুরু হল ধীর গুরুভার পদক্ষেপ, সংখ্যায় প্রথমটার সিকিভাগ হলেও, চলল প্রায় একই সময় ধরে। শেষ ভারী পদশব্দটির পরই আবার সেই দ্রুত লঘু পদসঞ্চার, এবং তার শেষে পুনরায় আবার ভারী পদশব্দ। দুটো আওয়াজই একই পায়ের সন্দেহ নেই, কারণ দুটি পদশব্দেই মিশে আছে একই জুতোর একই মশমশ আওয়াজ।

ফাদার ব্রাউনের স্বভাব এমনই, যে কোন রহস্য না থাকলে মাথা না ঘামিয়ে পারেন না। এই তুচ্ছ ব্যাপারটার চিন্তাতেও তাই তাঁর মনে হল মাথার মধ্যে বিস্ফোরণ হচ্ছে। তিনি লোককে লাফ দেবার জন্যে দৌড়তে দেখেছেন, গড়িয়ে নামার জন্যে দৌড়তে দেখেছেন, কিন্তু এ যেন হাঁটার জন্যে দৌড়ানো, কিম্বা দৌড়ানোর জন্যে হাঁটা। অদৃশ্য পদযুগলের অদ্ভুত ব্যবহারের এছাড়া কোন ব্যাখা নেই। পায়ের মালিক করিডোরের অর্ধেকটা ধীরে ধীরে টহল দেবার জন্যে বাকি অর্ধেকটা দৌড়ে নিচ্ছে, কিম্বা করিডোরের এক অংশে মন্থর গতিতে হেঁটে দৌড় লাগাচ্ছে বাকি অংশে। অথচ দুটো অনুমানেরই কোন অর্থ হয়না। ফাদার ব্রাউনের মনে হল ঘরের সাথে সাথে তাঁর মগজেও বোধহয় ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসছে।

কিন্তু তর্বু ভাবা থামালেন না তিনি। প্রকোষ্ঠের অন্ধকারে আরো যেন ছবির মতই স্পষ্ট হয়ে উঠল তাঁর চিন্তার স্রোত। তিনি যেন মানসচক্ষে দেখতে পেতে লাগলেন অতিপ্রাকৃত কোন সংকেতের মতই একজোড়া কাল্পনিক পা যেন লাফিয়ে বেড়াচ্ছে করিডোর দিয়ে। একি কোন অখ্রীস্টীয় ধর্মনৃত্য ? নাকি কোন নতুন বৈজ্ঞানিক গবেষণা ? নিজের মনে খুঁটিয়ে পদশব্দের অর্থোদ্ধার করার চেষ্টা করতে লাগলেন ফাদার ব্রাউন। প্রথম পদশব্দটি অতি অবশ্যই হোটেলের মালিকের নয়। তার মত লোকেরা হয় দ্রুত পায়ে হংসগতিতে হাঁটে, আর নয়ত চুপ করে বসে থাকে। কোন বেয়ারা বা কর্মচারীর পদশব্দের মতও শোনাচ্ছে না ও আওয়াজ। অভিজাততান্ত্রিক সমাজের নিচু স্তরের লোকজন কখনো কখনো মদের নেশায় ইতস্ততঃ টলে বেড়ালেও, এ ধরণের বিলাসভবনে হয় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, আর নয় সিঁটিয়ে বসে থাকে।

কিন্তু এই ভারী পায়ে লাফিয়ে হাঁটার চাল, এই বলিষ্ঠ অথচ অবহেলাভরা পদক্ষেপ, এই অনিচ্ছাকৃত অথচ ভ্রূক্ষেপহীন পদশব্দ, এ সবই পরিচায়ক একটি মাত্র জীবের। বাইরে হাঁটছেন পশ্চিম ইউরোপীয় কোন অভিজাতপুরুষ - খুব সম্ভবতঃ এমন এক ব্যক্তি যাঁকে অন্নসংস্থানের জন্যে পরিশ্রম করতে হয়নি জীবনে কখনো।

ফাদার ব্রাউন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পৌঁছতেআবার পাল্টে গেল পদশব্দ, কে যেন দ্রুত লঘুপায়ে তীরবেগে বেরিয়ে গেল ঘরের সামনে দিয়ে। এবারের পদক্ষেপ আরও দ্রুত, পদশব্দ আরও ক্ষীণ। যেন কেউ ছুটছে পা টিপে টিপে। নিজের উপস্থিতি গোপন করতে চাওয়া লোকের হাঁটা এ নয়। এভাবে হাঁটে অন্য কেউ। কিন্তু এভাবে যে কারা হাঁটে তা অনেক ভেবেও ফাদার ব্রাউন নির্ণয় করতে পারলেন না। মনের কোনে তাঁর একটা অস্পষ্ট স্মৃতি বারে বারে উঁকি দিলেও ঠিক মনে করে উঠতে পারলেন না তিনি এ আওয়াজ আগে কোথায় শুনেছেন। জোর করে মনে করতে গিয়ে মাথা গরম হয়ে উঠল তাঁর। হঠাৎ মাথায় নতুন কি একটা চিন্তা আসতে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। তাঁর ঘরে প্যাসেজের দিকে কোনো দরজা নেই, একটা দরজা একপাশে কাঁচের অফিসঘরের দিকে, আর অন্য দরজাটা ক্লোক রুমের দিকে। অফিসঘরের দরজাটা ঠেলে দেখলেন, সেটা বন্ধ। চোখ গেল একটি মাত্র জানালার দিকে, নীলবর্ণ মেঘেদের গায়ে অস্তগামী সূর্যের লালিমার খেলা চলছে সেখানে। শিকারী কুকুরের মতই যেন অশুভ কিছুর গন্ধ পেলেন তিনি।

বাগে আনলেন নিজের মনকে ফাদার ব্রাউন। তাঁর মনে পড়ল যে হোটেলের মালিক তাঁকে বলেই গিয়েছিল যে দরজাটা সে আটকে যাচ্ছে, খুলে দেবে পরে এসে। মনকে প্রবোধ দিলেন, যে বাইরের পায়ের আওয়াজের একশো এক যথাযথ কারণ থাকতে পারে। নিজেকে মনে করালেন, যে দিনের যেটুকু আলো অবশিষ্ট আছে তার মধ্যে তাঁর হাতের কাজটুকু সেরে ফেলতে হবে। জানালার কাছে শেষ ম্রিয়মান আলোতে কাগজখানা এনে ফের তিনি আরম্ভ করলেন লেখা। অল্প আলোয় কাগজে প্রায় মুখ গুঁজে মিনিট বিশেক লিখেছেন, এমন সময় সটান সিধে হয়ে বসলেন ফাদার ব্রাউন - করিডোরে আবার সেই পদশব্দ।

কিন্তু এবারে শব্দটা খানিকটা অন্যরকম। এর আগে অত্যন্ত লঘু এবং দ্রুত পায়ে গেলেও আগন্তুক হাঁটছিল। কিন্তু এবারে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে সে দৌঁড়াচ্ছে। দ্রুতগামী দুরন্ত চিতার মত আলতো পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে সবেগে ধেয়ে আসছে করিডোর দিয়ে। বাইরের আগন্তুক কোন কর্মঠ বলিষ্ঠ ব্যক্তি, কিন্তু স্পষ্টতই অত্যন্ত সময়াভাব রয়েছে তার। অথচ ঝড়ের মত অফিসের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতে না যেতেই পায়ের আওয়াজ আবার পাল্টে গেল সেই ওজনদার, সদম্ভ, পদক্ষেপ।

হাতের কাগজখানা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন ফাদার ব্রাউন। অফিসের দরজাটা বন্ধ, তাই ছুটে গেলেন ক্লোকরুমের দরজার দিকে। অতিথিরা সব ডিনারে, আপাততঃ কোন কাজ নেই বলে ক্লোকরুমের কর্মচারীটি উধাও হয়ে গেছে খানিক্ষণের জন্যে। ওভারকোটের ধূসর পাহাড় ঠেলে ফাদার ব্রাউন পৌঁছলেন ক্লোকরুমের ভেতরে।

প্রায়ান্ধকার ক্লোকরুম আর আলোকিত করিডোরের মাঝখানে একটা কাউন্টার। কাউন্টারের উপরের অর্ধচন্দ্রাকৃতি খিলানের ওপরের বাতি লাগানো এমনভাবে যে তার দ্যুতি অল্পই পড়ল ফাদার ব্রাউনের ওপর। পেছনের জানলার সূর্যাস্তের সামনে তাঁকে দেখা গেল কেবল ছায়ামূর্তির মতই। কিন্তু সেই একই আলোয় প্রায় থিয়েটারি ঢঙে উদ্ভাসিত হয়ে দেখা গেল করিডোরে ক্লোকরুমের কাউন্টারের সামনে দাঁড়ানো লোকটিকে।

সাধারণ সান্ধ্য পরিচ্ছদ পরণে মার্জিত চেহারার পুরুষমানুষ। চেহারায় দীর্ঘাকৃতি কিন্তু বৃহদায়তন নয়। দেখলেই বোঝা যায় নিজের চাইতে অনায়ত চেহারার লোকেদের থেকেও বেশী অবলীলায় নির্বিঘ্নে, অগোচরে চলাফেরায় সক্ষম সে। উজ্জ্বল দীপালোকে শ্যামবর্ণ, প্রাণোচ্ছল মুখখানা দেখে বোঝা যায় বিদেশী বলে। সুঠাম প্রফুল্ল চেহারায় আত্মবিশ্বাসের ছাপ। দোষের মধ্যে শুধু পরণের কালো কোটখানা চেহারার অনুপাতে বেশ খেলো, এমনকি ফুলে উঁচু-নিচু হয়ে রয়েছে জায়গায় জায়গায়। অস্তগামী সূর্যের সামনে ফাদার ব্রাউনের ছায়ামূর্তিখানা চোখে পড়তেই নম্বর লেখা একটুকরো কাগজ বাড়িয়ে দিল আগন্তুক। ভদ্রভাবে হুকুম করল, আমার টুপি আর কোটটা দেখি। আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে।

বিনা বাক্যব্যয়ে কাগজ নিলেন ফাদার ব্রাউন। এধরণের গোলামি তাঁর কাছে নতুন কিছু নয়, আজ্ঞা পালন করতে খুঁজতে গেলেন কোট। ইতিমধ্যে ওয়েস্টকোটের পকেট হাঁতড়াচ্ছিল আগন্তুক, পকেট থেকে আধ মোহর বের করে ছুঁড়ে দিয়ে তুলে নিল ফাদার ব্রাউনের আনা কোটখানা। হাসতে হাসতে বলল,

- না হে, পকেটে তো চাঁদির টাকা কিছু নেই দেখছি, এটাই রাখো তাহলে।

ফাদার ব্রাউনের শরীর অন্ধকারে নিস্পন্দ রইলেও তাঁর মাথা গেল ঘুরে। অবশ্য তাঁর মাথা ঘুরলেই বেশী উর্বর হয়ে পড়ে। তখন তিনি দুয়ে দুয়ে চারের বদলে চারকোটি বানিয়ে ফেলেন। তাঁর ক্যাথলিক চার্চের এ ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ নয়, তিনি নিজেও যে এটা খুব পছন্দ করেন তা নয়, কিন্তু এই ধরণের অনুপ্রেরণার জোরেই তিনি প্রয়োজনীয় মুহূর্তে খুঁজে পান উত্তর।

- কিছু মনে করবেন না মশাই, কিন্তু চাঁদি বোধহয় আপনার পকেটে প্রচুর পরিমাণেই আছে - বেশ ভদ্রভাবেই বললেন তিনি।

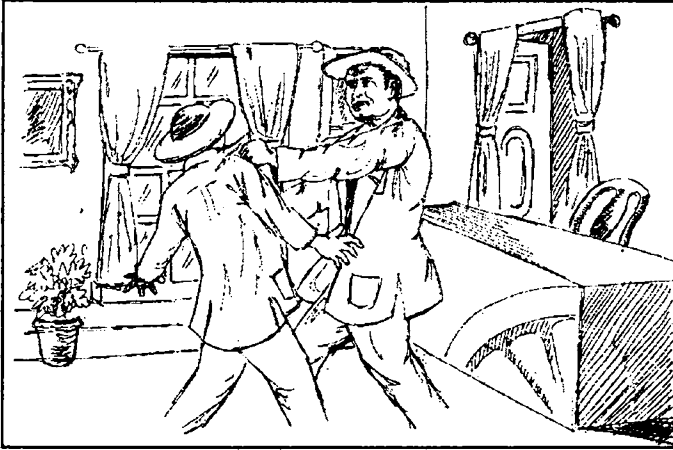
চোখ পাকাল আগন্তুক। বলল,

- যাব্বাবা, তোমাকে তোমাকে আধখানা সোনার মোহর দিলাম, তাও গজগজ করছ কেন ?

- কারণ কখনো কখনো রুপোর দাম সোনার চেয়ে বেশী হয় - বললেন প্রাদ্রীমশাই - বিশেষতঃ যখন ওজনে ভারী হয়।

কোতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল আগন্তুক ফাদার ব্রাউনের দিকে। তারপর ততোধিক কৌতূহলী দৃষ্টিতে ভাল করে দেখে নিল বাইরের দরজার দিকে যাবার প্যাসেজ। তারপর ফের ফাদার ব্রাউনের দিকে তাকিয়ে তাঁর পেছনের সূর্যাস্তের শেষ রঙ লাগা জানালাটা খুঁটিয়ে দেখে কি যেন মনস্থির করে নিল। কাউন্টারের ওপর একটা হাত রেখে তুখোড় ব্যায়ামবিদের মত লাফিয়ে টপকে গেল কাউন্টার। বজ্রমুষ্টিতে ফাদার ব্রাউনের কলার ধরে প্রায় চড়াও হয়ে দাঁড়াল তাঁর ওপর। হিংস্র অনুচ্চ কণ্ঠে বলল,

- চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক। আমি তোমাকে ভয় দেখাতে চাই না। কিন্তু —



বজ্রমুষ্টিতে ফাদার ব্রাউনের কলার ধরে প্রায় চড়াও হয়ে দাঁড়াল।

- কিন্তু আমি তোমাকে ভয় দেখাতে চাই - ডমরু কণ্ঠে বললেন ফাদার ব্রাউন - ভয় দেখাতে চাই নরকের অনন্ত আগুনের আর পাপের সাজার।

- তুমি তো দেখছি অদ্ভুত ধরণের আর্দালি হে - বলল আগন্তুক।

- আমি পাদ্রী মঁসিয় ফ্লাম্বো - বললেন ফাদার ব্রাউন - আর আমি তোমার স্বীকারোক্তি শুনতে রাজী আছি।

হাঁ করে খানিক্ষণ তাকিয়ে রইল আগন্তুক, তারপর টলতে টলতে পিছিয়ে গিয়ে বসে পড়ল একটা চেয়ারে।

দ্বাদশ যথার্থ ধীবরদের ডিনারের প্রথম দুটি পর্ব নির্বিঘ্নে সমাধা হয়েছে সফল ভাবেই। আমার কাছে সেসবের মেনু নেই, থাকলেও আপনারা কিছু বুঝতেন না। খাস বাবুর্চীদের লেখা সে সব ফরাসী নাম খোদ ফরাসীদের কাছেও দুর্বোধ্য। ক্লাবের রীতি অনুযায়ী প্রথম পর্বে ছিল বিবিধ প্রকারের জলখাবার, মাথা খারাপ করানোর সংখ্যা আর বৈচিত্র তাদের। একেবারেই বাড়তি এবং অনাবশ্যক এ

পর্বটি, এ ক্লাব আর এ ডিনারের মতই, এবং সে কারণেই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

এর পর সূপের পর্ব। ক্লাবের রীতি মাফিক অনাড়ম্বর লঘু চেহারা তার - বুঝিবা আসন্ন মাছের পদটির সংযত প্রতীক্ষা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গোপনে শাসন করে সাধারণ ইংরেজের অবোধ্য যে ধরণের বিচিত্র অবহেলা ভরা কথপোকথন, এই সময়ে বার্তালাপ চলছিল সেই রকমই। নিরুৎ সাহ কৃপার ভঙ্গীতে সম্বোধিত হচ্ছিলেন দুতরফের মন্ত্রীগণ। সংস্কারবাদী বিত্তমন্ত্রীটি তাঁর খাজনা উসুলের দায়ে সমস্ত টোরী পার্টির চক্ষুশূল - কিন্তু তিনি প্রশংসা কুড়োলেন তাঁর অপটু কবিতা আর শিকারে অশ্বচালনার দক্ষতার জন্যে। টোরী প্রধানকে উদারপন্থীরা উৎপীড়ক বলে ঘৃণা করেন, অথচ তিনি প্রশংসিত হলেন উদারপন্থী বলে। আলোচনায় রাজনেতারা প্রাধান্য পেলেও আলোচিত হল তাঁদের রাজনীতি ছাড়া বাকি সব কিছু।

এই অলীকবিলাসী অথচ অশিথিল সমিতির যথার্থ প্রতিভূ মিঃ অডলে। গ্ল্যাডস্টোন কলার আঁটা প্রৌঢ় অমায়িক ভদ্রলোক। জীবনে কখনো বিশেষ কিছু করেননি তিনি - কোন অন্যায় কাজও নয়। অতুৎসাহী তিনি নন। অতি ধনীও তাঁকে বলা চলে না। তিনি স্রেফ সমাজে বিদ্যমান এবং সেই কারণেই প্রতিপত্তিশালী। তাঁকে উপেক্ষা করার সাহস রাখে না কোন পার্টিই। চাইলেই মন্ত্রীসভার সদস্য হতে পারেন না তিনি যে কোন দিনই।

সমিতির ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিউক অফ চেস্টার - নবীন উঠতি রাজনেতা। হাল্কা রঙের সপাট চুল আর মেচেতা পড়া মুখের তরুণ। পরিমিত মেধা এবং অপরিমিত সম্পত্তি তাঁর। জনসমক্ষে সর্বদাই সমাদৃত তিনি, এবং চলেনও একটি সাধারণ নিয়ম মেনে। কোন রসিকতা মাথায় এলে সঙ্গে সঙ্গে জাহির করে ফেলে প্রশংসা কুড়োন তীক্ষ্ণধী বলে। আর রসিকতা মাথায় না থাকলে 'এটা মস্করার সময় নয়' বলে প্রশংসা পান কর্মদক্ষ বলে। কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে, এ হেন ক্লাবে তাঁর সমপর্যায়ের মানুষদের মাঝে, অতি নিরীহ, সরল, কিশোরসুলভ ব্যবহার তাঁর।

মিঃ অডলে অবশ্য ডিউকের মত কোনদিন রাজনীতি করেন নি। তাই বোধহয় তাঁর ব্যবহারে রাজনীতির প্রতি উপেক্ষা অপেক্ষাকৃত কম। উপস্থিত বাকি সবাই অস্বস্তি বোধ করলেও কথাবার্তায় মাঝে মাঝে ইঙ্গিত করেছিলেন যে

উদারপন্থী আর রক্ষণপন্থীদের মধ্যে অল্প হলেও কিছু তফাৎ আছে। নিজে অবশ্য তিনি রাজনৈতিক বিশ্বাস আর ব্যক্তিগত জীবন, দুয়েতেই রক্ষণপন্থী। ঘাড়ের ওপর বেলনাকারে পাকানো চুল তাঁর চেহারাটাকে করে তুলেছে সেকেলে রাষ্ট্রনীতিকের মত। পেছন থেকে দেখলে সাম্রাজ্যের অভিপ্রেত ব্যক্তি বলে মনে হয়। সামনে থেকে দেখলে অবশ্য বোঝা যায় মৃদুস্বভাব, অকৃতদার ভোগীপুরুষ বলে।

আগেই বলেছি, ছাদের টেবিলে মোট চব্বিশটা চেয়ার, কিন্তু ক্লাবের সদস্য সাকুল্যে মাত্র বারো। সুতরাং ছাদখানা বেশ আরামেই দখল করেছিলেন তাঁরা। ছাদের ভেতর দিকটাতে টেবিলের একপাশে সার দিয়ে বসেছিলেন তাঁরা। টেবিলের অন্যপাশটা ছিল ফাঁকা। সেদিক দিয়ে নজরে পড়ছিল বাগানের শোভা। বছরের এ সময়টার পক্ষে সন্ধ্যার আলো একটু বেশী ম্রিয়মাণ হলেও সেখানে রঙের প্রাণোচ্ছল খেলা। পঙক্তির মাঝখানে চেয়ারম্যানের আসন, আর একদম ডান প্রান্তে ভাইস প্রেসিডেন্টের।

এমনই এখানকার আদবকায়দা যে এই দ্বাদশ অতিথি দল বেঁধে পাতে বসার সময়ে দেওয়ালের সামনে সার দিয়ে দাঁড়াত পনেরজন পরিচারক - যেন রাজসকাশে অভিবাদন জানাচ্ছে সৈন্যদল। আর বিস্ময় উদ্ভাসিত চেহারায় ক্লাবের সদস্যদের ঝুঁকে ঝুঁকে সেলাম জানাতেন মালিক স্বয়ং, যেন এ অতিথিদের আগে কখনো দেখেননি। অবশ্য ছুরিকাঁটার প্রথম নিক্কণটি হবার আগেই উধাও হয়ে যেত এই সেবক বাহিনী। থালাবাসন তুলতে বা দিতে প্রয়োজন যে দু একজনের খালি তারাই দৌড়ে বেড়াত অসীম নীরবতায়। সৌজন্যের আড়ম্বর দেখিয়ে তারও আগে বিদায় নিতেন হোটেল মালিক মিঃ লিভার। আবার কদাচ আবির্ভূত হতেন না তিনি। কিন্তু তবুও সবসেরা মাছের পদটির আগমনে আঁচ পাওয়া গেল তাঁর ব্যক্তিত্বের। বোঝা গেল তিনি উপস্থিত আছেন কাছাকাছিই। এই পবিত্র মৎসব্যঞ্জনটির চেহারা (ইতরসাধারণের চোখে) দানবিক পুডিঙের মত। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বিবাহের কেকের থেকে কোন অংশে কম নয়। বহু ধরণের, বহু সংখ্যক মাছ তাদের ঈশ্বরদত্ত চেহারা হারিয়ে লয় হয়েছে এতে। দ্বাদশ ধীবররা তাঁদের সেই বিখ্যাত মাছের ছুরি চামচ হাতে এটির দিকে এমনভাবে এগোলেন যেন পুডিঙের প্রতিটি ইঞ্চির দাম তাঁদের ওই ছুরি চামচের চেয়ে কোন মতেই কম নয়। কে জানে, হয়ত হবেও বা তাই। অধীর ক্ষুধার্ত নীরবতায় মগ্ন হলেন সবাই তাতে।

পাত প্রায় খালি হয়ে আসার পরই তবে মুখ খুললেন তরুণ ডিউক। প্রথামতো বললেন,

- এখানে ছাড়া এমনটি আর কোথাও বানায় না।

- কোথাও না - তাঁর দিকে ফিরে গভীর নিনাদে বললেন মিঃ অডলে। সায় দিয়ে ঝাঁকালেন তাঁর প্রবীণ মাথাখানা - এখানে ছাড়া কোথাও না। আমাকে একবার বলা হয়েছিল যে কাফে অ্যাংলেতে ——————

থালা তুলে নিয়ে যাওয়াতে এখানে কথার মাঝকানে বাধা পড়ে কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হলেন মিঃ অডলে। কিন্তু তাঁর চিন্তার মূল্যবান সূত্রখানা ফের ধরে ফেলতে বেশী দেরি হল না তাঁর,

- আমাকে বলা হয়েছিল কাফে অ্যাংলেতে নাকি এ জিনিষ পাওয়া যায়। একদম নয় মশাই - ফাঁসী দেওয়া বিচারকের মত নির্দয় ভাবে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন তিনি - একদম নয়।

- মাত্রাধিক মূল্যায়ন হয়েছে জায়গাটার - বললেন জনৈক কর্ণেল পাউণ্ড। মাসখানেকের ভেতর এই বোধহয় প্রথম মুখ খুললেন তিনি।

- না, না, তা নয় - বাধা দিলেন আশাবাদী স্বভাবের ডিউক অফ চেস্টার -ওখানের কয়েকটা জিনিস তো বেশ ভালই। যেমন ওখানে সবসেরা ——————

দ্রুতবেগে প্রবেশ করেই আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল একজন পরিচারক। তার আগমনের মতই নিঃশব্দ তার এই সহসা গতিরোধ। কিন্তু এইসব সদয়, অমনোযোগী ভদ্রমহোদয়গণ তাঁদের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত চতুঃপার্শ্বের পরিকাঠামোর নির্বিঘ্ন ব্যবহারে এমনই অভ্যস্ত যে পরিচারকের এহেন অপ্রত্যাশিত ব্যবহারের চমকে আঁতকে উঠলেন তাঁরা। যদি অতিপ্রাকৃত কোন ঘটনা ঘটে - যেমন ধরুন একটা চেয়ার যদি হঠাৎই ছুটে পালায়, তাহলে আমাদের যেমন অবস্থা হবে,তাঁদের দশা হলো প্রায় সেইরকমই।

হাঁ করে কয়েক মুহুর্ত তাকিয়ে রইল পরিচারক, আর উপস্থিত সবার মুখে ফুটে উঠল এযুগের বৈশিষ্ট্য এক অদ্ভুত কুণ্ঠার ছাপ। আধুনিক মানবতাবাদ আর

ধনী এবং দরিদ্রের মননের মাঝখানের অতলান্ত খাদের সংমিশ্রণ থেকে উদ্ভূত এ মনোভাব। ইতিহাস প্রসিদ্ধ বংশের কোন খাঁটি অভিজাতপুরুষ হলে হয়ত পরিচারককে হাতের কাছে যা পেতেন তাই ছুঁড়ে মারতেন। বোতল দিয়ে আরম্ভ করতেন, অর্থ দিয়ে শেষ করতেন। খাঁটি গণতন্ত্রপন্থী কোন ব্যক্তি হলে হয়ত নির্মল সৌহার্দ্যপূর্ণ ভাষায় পরিচারকের কাছে জানতে চাইতেন যে সে হতচ্ছাড়া কি করতে চাইছে। কিন্তু এহেন আধুনিক ব্যক্তিতান্ত্রিকরা দরিদ্রের সংস্পর্শে বড়ই অস্বস্তি বোধ করেন, তা সে মানুষটা দাসই হোক আর মিত্রই হোক। কোন খিদমদগার সমস্যায় পড়লে অশেষ লজ্জায় ম্রিয়মাণ হন তাঁরা। নির্মম হতে অপারগ তাঁরা, এদিকে আবার পরকে বদান্যতা দেখাবার প্রয়োজনবোধেই হন শঙ্কিত। সমস্যাটা যাই হোক না কেন, শুধু সেটা মিটে গেলেই পান স্বস্তি। অবশ্য মিটেও গেল - কয়েক মুহূর্ত স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে থাকার পর পরিচারকটি পেছন ফিরে দৌড় লাগাল উন্মাদের মত।

খানিক বাদে যখন তার পুনরার্বিভাব ঘটল দোরগোড়ায়, তখন তার সঙ্গে দ্বিতীয় আর একটি পরিচারক। অধীরভাবে অঙ্গভঙ্গি করে নিম্নস্বরে আলোচনা আরম্ভ করল দুজনে পাক্কা দক্ষিণ ইউরোপীয় কায়দায়। তারপর দ্বিতীয় পরিচারককে রেখে বিদায় হল প্রথমজন এবং ফেরৎ এল তৃতীয় আর একজন কে নিয়ে।

কিন্তু এই চকিত সম্মীলনীতে যখন চতুর্থ পরিচারকটি যোগদান করল, তখন কর্তব্যের খাতিরে নীরবতা ভঙ্গ করতে বাধ্য হলেন মিঃ অডলে। সভাধিপতির হাতুড়ির বদলে ব্যবহার করলেন একটি উচ্চগ্রামের কাশি, এবং বললেন,

- মূচার তো বর্মায় চমৎকার কাজ করছে। পৃথিবীর আর কোন দেশ —

তীর বেগে তাঁর দিকে ছুটে এল পঞ্চম পরিচারক। কানে ফিস ফিস করে বলল,

- মাপ করবেন। জরুরী ব্যাপার। মালিক মশাই আপনার সাথে একবার কথা বলতে পারেন কি?

হতভম্বভাবে পেছনে ফিরলেন চেয়ারম্যান মশাই। বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখলেন তাঁর সেই দুলকিচালে মিঃ লিভার আসছেন তাঁদের দিকে। তবে তাঁর হাঁটার চালে

কোন পরিবর্তন না এলেও মুখের চেহারা গেছে পাল্টে - অমায়িক তাম্রবর্ণের বদলে এখন পাংশু পীতাভ রঙ তার।

- মাপ করবেন মি: অডলে - শ্বাসকষ্টে পীড়িত মানুষের মত রুদ্ধশ্বাসে বললেন তিনি - বড় শঙ্কিত হয়ে পড়েছি আমি। আপনাদের মাছের থালাগুলো কি ছুরিচামচ সমেতই তুলে নিয়ে গেছে?

- আশা তো করি তাই - ঈষৎ প্রীতিপূর্ণ স্বরে বললেন চেয়ারম্যান মশাই।

- দেখেছেন তাকে? যে বেয়ারাটা ওগুলো নিয়ে গেছে? - উত্তেজিতভাবে প্রশ্ন করলেন হোটেল মালিক - চেনেন তাকে?

- বেয়ারাকে চিনি? সক্রোধে উত্তর দিলেন মি: অডলে - আদপেই না!

নিদারুন মর্মপীড়ার ভঙ্গিতে দুহাত ছড়িয়ে দিলেন মি: লিভার। বললেন

- ওকে আমি পাঠাই নি। কখন বা কেন এসেছিল তাও জানিনা। আমি আমার বেয়ারাকে পাঠিয়েছিলাম থালা তুলতে। সে এসে দেখে ততক্ষণে থালা তোলা হয়ে গেছে।

মি: অডলের হতভম্ব চেহারা দেখে তাঁকে আর সাম্রাজ্যের অভিপ্রেত ব্যক্তি বলে মনে হচ্ছিল না। নীরবে বসে রইলেন বাকি সবাই শুধু কাষ্ঠবৎ কর্নেল পাউন্ড ছাড়া। একমাত্র তাঁকেই মনে হল যেন কোন বৈদুতিক বলে নবজীবন লাভ করেছেন। সবাইকে ফেলে ঋজু ভঙ্গিমায় চেয়ার ছেড়ে একাই উঠে দাঁড়ালেন তিনি, চশমাখানা পেঁচিয়ে আটকালেন চোখে। কথা বললেন এমন কর্কশ নিম্নস্বরে যেন নিজের বাচনশক্তি প্রায় বিস্মৃত হয়ে পড়েছেন তিনি। বললেন,

- তুমি কি বলতে চাইছ যে কেউ আমাদের রুপোর বাসনপত্র হাতিয়ে সরে পড়েছে?

উত্তরে আবার অসহায় ভঙ্গীতে দুহাত ছড়িয়ে দিলেন মালিক। এবং এক লহমায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন টেবিলের বাকি সবাই।

- তোমার বেয়ারারা সবাই এখানে আছে? আবার কর্কশ নিম্নস্বরে প্রশ্ন করলেন কর্নেল।

- হ্যাঁ সবাই আছে। আমি নিজে দেখেছি - উত্তর দিলেন তরুণ ডিউক। কিশোরসুলভ মুখখানা বাড়িয়ে দিলেন ভিড়ের মাঝে - এখানে ঢোকার সময়ে আমি একবার করে গুণে নিই। দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে ওদের এমন বিচিত্র দেখায়!

- কিন্তু নিশ্চিত করে বলা যায় কি? ইতস্তত: ভাবে বললেন মি: অডলে।

- আমি নিশ্চিত। উত্তেজিতভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন ডিউক - এখানে পনেরোজনের বেশী বেয়ারা কখনো থাকে না, আজ ও ছিল না। একজন বেশীও না, কমও না।

হোটেল মালিক ফিরলেন তাঁর দিকে। বিস্ময়ে কম্পমান তাঁর চেহারা।

- আপনি বলছেন .... আপনি বলছেন - কথা জড়িয়ে গেল তাঁর - আমার পনেরজন বেয়ারাকেই আপনি দেখেছেন?

- হ্যাঁ দেখেছি - উত্তর দিলেন ডিউক - কি হয়েছে তাতে?

- কিচ্ছু না - খাদে নেমে গেল লিভার মশায়ের গলা - তবে আমার মনে হয় না আপনি পনেরজনকে দেখে থাকতে পারবেন। কারণ তাদের মধ্যে একজন ওপরতলায় মরে পড়ে আছে।

মুহূর্তের মধ্যে ঘরে নেমে এল জমাট নিস্তব্ধতা। ঘরের প্রতিটি ব্যক্তি নিজের ভেতর তাকিয়ে খেয়াল করলেন কতটা সংকুচিত হয়ে গেছে তাঁদের অন্তরআত্মা। একজন - খুব সম্ভবত: ডিউকই - বিত্তশালী নির্বোধের মত সদয়ভাবে বলেই ফেললেন,

- তার জন্যে আমরা কিছু করতে পারি কি?

- ওর কাছে পাদ্রী পাঠিয়ে দিয়েছি। ভাবলেশহীনভাবে বললেন ইহুদী লিভার।

বুঝিবা কোন আসন্ন প্রলয়ের ঘন্টাশব্দে সম্বিত ফিরে পেলেন সবাই। সম্যক অনুধাবন করলেন নিজের অবস্থাটা। কয়েকটি অস্বাভাবিক মুহূর্তের জন্যে পঞ্চদশ পরিচারকটিকে উপরের মৃত ব্যক্তির প্রেত বলে ভাবছিলেন সবাই। ভিখীরি আর প্রেত, দুয়েতেই বড় লজ্জা পান তাঁরা, তাই এতক্ষণ মূক ছিলেন

সেই ভাবের পীড়নে। কিন্তু হারানো রজত তৈজসের স্মৃতি নির্মমভাবে খানখান করে দিল অতিপ্রাকৃতের অলীক চিন্তাকে। চেয়ার উল্টে দরজার কাছে লাফিয়ে গেলেন কর্নেল। বললেন,

- বন্ধুগণ, পঞ্চদশ বেয়ারা যদি এখানে থেকেই থাকে, তাহলে সেই ব্যক্তিই চোর। নিচে গিয়ে আগে সামনের আর পেছনের দরজা আগলান, তারপর কথা হবে। ওই চব্বিশটা মুক্তো আমাদের উদ্ধার করতেই হবে।

মিঃ অডলে প্রথমে খানিকটা ইতস্তত: করছিলেন, ভাবছিলেন তাড়াহুড়ো কর কিছু করাটা যথেষ্ট ভদ্রজনোচিত হবে কিনা, কিন্তু যখন দেখলেন সিঁড়ি দিয়ে ডিউক দৌড়চ্ছেন যৌবনচিত উদ্যমে, তিনিও প্রবীণ লয়ে অনুসরণ করলেন তাঁর।

সে সময়েই ছুটে এল ষষ্ঠ এক পরিচারক - বাসনের তাকে স্তুপীকৃত মাছের থালাগুলো খুঁজে পেয়েছে সে, কিন্তু রূপোর ছুরি চামচের কোন চিহ্ন নেই।

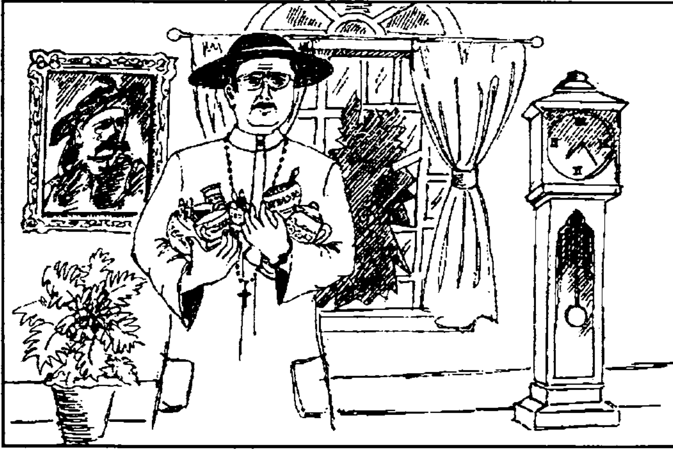
অতিথি আর পরিচারকের দলটা হুড়মুড়িয়ে নেমে এসে ভাগ হয়ে গেল দুভাগে। ধীবরদের বেশিরভাগই মালিকের অনুসরণ করলেন সামনের দিকে, সেখান দিয়ে কেউ বেরিয়েছে কিনা খোঁজ নেবার জন্য। কর্নেল পাউন্ড, চেয়ারম্যান সাহেব, ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং আরো দুএকজন পেছনের রাস্তাই পলায়নের পক্ষে বেশী সুগম মনে করে করিডোর ধরে দৌড়লেন ভৃত্যমহলের দিকে। মাঝপথে নজরে পড়ল কুলুঙ্গীর মত ক্লোকরুমের প্রায়ন্ধকার কুঠরি, আর তার পেছনের দিকে ছায়ায় দাঁড়ানো কালো কোট পরিহিত খর্বকায় এক ব্যক্তি, বুঝিবা আর্দালী।

- ওহে! চেঁচিয়ে ডাকলেন ডিউক - এখান দিয়ে কাউকে যেতে দেখেছ?

উত্তর দিলেন না খর্বকায় ব্যক্তি। শুধু বললেন,

- মশাইরা যা খুঁজছেন তা বোধহয় আমার কাছেই পাবেন।

বিস্মিত বিচলতায় দাঁড়িয়ে পড়লেন সবাই। খর্বকায় ব্যক্তি চলে গেলেন ক্লোকরুমের পেছনের দিকে। ফিরে এলেন দুহাত ভর্তি রুপোর জিনিষ নিয়ে। পণ্যবিক্রেতার মত শান্তভাবে সাজিয়ে ফেললেন কাউন্টারের ওপর। সবাই দেখলেন পড়ে রয়েছে এক ডজন ছুরিচামচ।



ঘরের জানলাখানা চুরমার হয়ে গেছে।

- তুমি —, তুমি— আরম্ভ করলেন কর্নেল পাউন্ড। বোঝা গেল এই প্রথম স্থৈর্য্য হারিয়েছেন তিনি। তারপর উঁকি দিলেন প্রায়ান্ধকার ক্লোকরুমের ভেতরে, আর নজর করলেন দুটো ব্যাপার। প্রথমত: খর্বকায়, কৃষ্ণ পরিচ্ছদ পরিহিত ব্যক্তির পরণে পাদ্রীর পোষাক। দ্বিতীয়ত: ঘরের জানলাখানা চুরমার হয়ে গেছে, যেন সবলে কেউ বেরিয়ে গেছে তার মধ্যে দিয়ে।

- ক্লোকরুমে জমা রাখার পক্ষে বড় দামি জিনিষ, কি বলেন? খোশমেজাজে প্রশ্ন করলেন পাদ্রীমশাই।

- আপনি —, আপনি এগুলো চুরি করেছিলেন নাকি? বিস্ফারিত নয়নে প্রশ্ন করতে গিয়ে কথা জড়িয়ে গেল মি: অডলের।

- করেও যদি থাকি, কমসে কম ফেরৎ তো দিয়ে দিচ্ছি। অমায়িকভাবেই জানালেন পাদ্রীমশাই।

- কিন্তু আপনি করেননি। ভাঙা জানলাটার দিকে তাকিয়ে বললেন কর্নেল পাউন্ড।

- সত্যি বলতে কি, না করিনি। কৌতুকপূর্ণ ভঙ্গীতে উত্তর দিলেন পাদ্রীমশাই। তারপর গম্ভীরভাবে বসে পড়লেন একটা টুলে।

- কিন্তু আপনি জানেন কে করেছিল। ফের বললেন কর্নেলসাহেব।

- তার আসল নাম জানি না - শান্তভাবে উত্তর দিলেন পাদ্রীমশাই - কিন্তু তার লড়ায়ের ক্ষমতা সমন্ধে অল্পবিস্তর জানি, আর তার অধ্যাত্মিক সঙ্কটের কথা জানি অনেকটাই। প্রথমটা জানতে পারলাম যখন সে আমার শ্বাসরোধ করার চেষ্টা করছিল। আর দ্বিতীয়টা বুঝলাম, যখন খানিক পরেই সে তার কৃতকর্মের জন্যে অনুশোচনা জানাল।

- তাই নাকি? অনুশোচনা জানাল! শুষ্ক হাসি হেসে বললেন তরুণ ডিউক।

পেছনে হাত রেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন ফাদার ব্রাউন। বললেন,

- কি বিচিত্র, তাই না? একটা বাউন্ডুলে চোর অনুতাপ প্রকাশ করে, অথচ যারা ধনী, সচ্ছল তারা কঠিনহৃদয়, তরলমতি। ইশ্বর বা মানুষের জন্যে শূন্যভান্ডার তাদের। কিছু মনে করবেন না মশাইরা, কিন্তু আপনারা বোধহয় আমার এক্তিয়ারের সীমা খানিক লঙ্ঘন করছেন। অনুতাপকে যদি আপনাদের ব্যবহারোপযোগী বিষয় বলে সন্দেহ হয়, তাহলে তার জ্বলন্ত প্রমাণ দেখুন আপনাদের ওই ছুরিচামচ। দ্বাদশ যথার্থ ধীবর আপনারা, আর আপনাদের রুপোর মাছ মাত্রতো এই! কিন্তু ইশ্বরের কৃপায় আমি মানবাত্মার ধীবর।

- লোকটাকে ধরতে পেরেছেন নাকি? ভ্রুকুটির সাথে প্রশ্ন করলেন কর্নেল সাহেব।

তাঁর কঠিন চাহনিতে চোখে চোখ রেখে উত্তর দিলেন ফাদার ব্রাউন,

হ্যাঁ, ধরেছি। ধরেছি তার অগোচর এমন এক বঁড়শি আর অদৃশ্য এমন এক ছিপে, যে সে অবাধে ঘুরে বেড়াতে পারবে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত অবধি, কিন্তু ফিরে আসতে বাধ্য হবে সুতোর একটি মাত্র টানে।

নেমে এল সুদীর্ঘ নীরবতা। ধীরে ধীরে সরে পড়লেন সবাই। কেউ বা পুনরুদ্ধার করা চামচ বন্ধুদের দেখাতে, কেউ বা মালিকের কাছে এই বিচিত্র ব্যাপার সমন্ধে খোঁজখবর দেখাতে। পড়ে রইলেন শুধু কঠোরমুখ কর্নেল সাহেব। কাউন্টারে বসে পা দোলাতে দোলাতে চিবোতে লাগলেন নিজের কৃষ্ণাভ গোঁফ। খানিক বাদে ধীর কণ্ঠে ফাদার ব্রাউনকে বললেন,

- লোকটা অত্যন্ত চতুর ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তার থেকেও চতুর লোক

আছে দেখছি।

- নি:সন্দেহে লোকটা চতুর ছিল - উত্তর দিলেন ফাদার ব্রাউন - কিন্তু আর কার কথা বলছেন বুঝতে পারছি না।

- আপনি, আবার কে? অল্প হেসে বললেন কর্নেলসাহেব - আমি লোকটাকে জেলে দিতে চাই না। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিত থাকুন। কিন্তু আপনি কি করে এ মামলার নিষ্পত্তি করলেন জানার জন্যে আমি মশাই বেশ কয়েকটা রুপোর ছুরিচামচ দিতে রাজী আছি। এখানে সবাইকার চেয়ে বেশী জানেন তো আপনিই।

সৈনিক পুরুষটির অকপট সারল্য ফাদার ব্রাউনের খানিক মনে ধরল বোধহয়। মৃদু হেসে বললেন,

- লোকটার পরিচয় দিতে পারব না, সে আমাকে কি বলেছিল তাও বলতে পারব না। কিন্তু তার বাইরে, আমি নিজে যেটুকু আবিষ্কার করেছি সেটা আপনাকে না বলার কোন কারণ দেখি না।

অপ্রত্যাশিত দক্ষতায় কাউন্টারে লাফিয়ে উঠলেন ফাদার ব্রাউন। কর্নেল পাউন্ডের পাশে বসে খর্বকায় পা দুখানা নাড়াতে লাগলেন, যেমনটি করে ফটকে বসা ছেলের দল। কাহিনী আরম্ভ করলেন এমনভাবে যেন ক্রিসমাসের আগুনের পাশে বসে গল্প শোনাচ্ছেন কোন পুরনো বন্ধুকে।

- বুঝলেন কর্নেল - বললেন তিনি - আমি ওই ছোট্ট ঘরখানা বন্ধ করে বসে লেখাজোখা করছিলাম, সেখান থেকে শুনতে পেলাম একজোড়া পা নেচে চলেছে এক বিচিত্র ছন্দে। প্রথমে দ্রুত হাল্কা মজাদার শব্দ - যেন বাজি ফেলে আঙুলে ভর দিয়ে ছুটছে কেউ। তারপর অবহেলা ভরা মশমশ পায়ের শব্দ, যেন সিগার হাতে বেড়াচ্ছে কেউ। অথচ বুঝতে পারছিলাম দুটো শব্দ একই পায়ের, আর দুটোই একের পর এক হয়ে চলছিল চক্রাকারে। প্রথমে দৌড়, তারপর ধীরগমন, তারপর আবার দৌড়। একটা লোক এরকম দুভাবে চলবে কেন এ নিয়ে চিন্তা করলাম বেশ খানিক্ষণ। প্রথমে অলসভাবে, তারপর উত্তেজিত মনে। একটা পদক্ষেপ আমি বুঝতে পারছিলাম - সে চলা ঠিক আপনারই মত কর্নেল। সচ্ছল অভিজাত পুরুষ কারোর জন্য অপেক্ষা করতে করতে হেঁটে বেড়ান

ওইভাবে। হাঁটেন শারীরিক স্ফূর্তিতে, মানসিক অস্থিরতার তাড়নায় নয়। কিন্তু অন্য পদক্ষেপটি চেনা চেনা ঠেকলেও ঠিক কোথায় সেটা শুনেছি কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না। নানা পর্যটনের সময় কোন সে বিচিত্র জীবে সঙ্গে মোলাকাত হয়েছিল আমার, যে হাঁটে ওই রকম অদ্ভুত ভাবে? তারপরেই কানে এল প্লেটের টুং করে আওয়াজ, আর দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে গেল উত্তর। এভাবে হাঁটে হোটেলের পরিচারকরা। শরীরের উদ্ধার্ঙ্গ হেলানো সামনের দিকে, দৃষ্টি নিচের দিকে, জমি থেকে ছিটকে যাচ্ছে পায়ের চেটো, উড়ছে ন্যাপকিন আর কোটের প্রান্তভাগ। আরো চিন্তা করলাম মিনিটখানেক। পরিষ্কার হয়ে গেল অপরাধের প্রণালীটি, যেন আমি নিজেই করতে চলেছি সেটা।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কর্নেল পাউন্ড তাকালেন ফাদার ব্রাউনের দিকে। কিন্তু তাঁর শান্ত ধূসর চোখজোড়ার শুন্য উদাস দৃষ্টি নিবদ্ধ কড়িকাঠের ওপর। ধীরে ধীরে বললেন,

- অপরাধও একটা শিল্প। অবাক হবেন না - নরকের কারখানার অপরাধ ছাড়াও আরো রকম শিল্প পাওয়া যায়। কিন্তু ঐশ্বরিক হোক আর শয়তান কলুষিতয় হোক, যে কোন শিল্পের একটা অপরিহার্য অঙ্গ আছে। শিল্পের নির্বাহ যত জটিলই হোক না কেন, তার মূল কেন্দ্রটুকু কিন্তু অত্যন্ত সরল। যেমন ধরুন হ্যামলেট নাটকখানি - কবর খনকদের বীভৎস চেহারা, উন্মাদিনীর ফুলের স্তবক, অসরিকের সৌখীন পোষাক, প্রেতের পান্ডুরবর্ণ, করোটির হাসি, এসব ঘটনাগুলো কিন্তু ফুলের মালার মত কালো পোষাক পরা একটি মাত্র বিষাদক্লিষ্ট মানুষের চারপাশে জড়ানো।

মৃদু হেসে নেমে দাঁড়ালেন ফাদার ব্রাউন। বললেন,

- এটাও কালো পোষাক পরা একটি মানুষের বিষাদময় কাহিনী।

কর্নেল অবাক চোখে তাকালেও বলে চললেন ফাদার ব্রাউন।

- হ্যাঁ, এ কাহিনীর কেন্দ্রেও কিন্তু একখানা কালো কোট। কিন্তু হ্যামলেটের মতই তাতে অলঙ্কার চড়েছে নানা বিচিত্র ঘটনা আর ব্যক্তির। যেমন ধরুন এই আপনারা। তারপর ধরুন একজন মৃত পরিচারক, যে উপস্থিত - তার থাকা উচিত না হওয়া সত্ত্বেও। তারপর কোন এক অদৃশ্য হাত, যা আপনাদের টেবিলে

থেকে হাওয়ায় লোপাট করেছে রুপোর বাসন। কিন্তু যে কোন চতুর অপরাধের মূলে থাকে অতি সাধারণ কোন ব্যাপার - রহস্যের নাম গন্ধ থাকে না তাতে। রহস্যের সৃষ্টি করা হয় তাকে চাপা দিতে, অনুসন্ধানী দৃষ্টিকে দুরে সরিয়ে নিয়ে যেতে। এই বিরাট, কৌশলী, লাভের অপরাধটির ভিত্তিও একটি অতি সাধারণ ব্যাপার - অভিজাতবর্গ আর পরিচারকদের পোষাক একইরকম। বাকিটুকু শুধু অভিনয়, বেশ নিপুণ অভিনয়।

- তা না হয় হল - দাঁড়িয়ে পড়ে নিজের জুতোর দিকে ভ্রুকুটি করলেন কর্নেল পাউন্ড - কিন্তু তাও আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

শুনুন কর্নেল - বললেন ফাদার ব্রাউন - যে দু:সাহসী অপরাধীপ্রবরটি আপনাদের ছুরি চামচ হাতিয়েছিল, সে এই প্যাসেজের বাতির আলোয় লোকের চোখের সামনে কমপক্ষে কুড়িবার হেঁটে গেছে। আলোকহীন কোন কোনায় গিয়ে আত্মগোপন করার চেষ্টা করেনি সে পাছে লোকের সন্দেহ হয়। হেঁটে গেছে শুধু আলোকোজ্জ্বল প্যাসেজ দিয়ে। আর যেখানেই গেছে তার উপস্থিতি মেনে নিয়েছে সবাই নির্বিদ্বিধায়। তাকে কেমন দেখতে আমায় জিজ্ঞেস করবেন না। আপনি নিজেই তাকে আজকে ছসাতবার দেখে থাকবেন। আপনি আর সব বাকি হোমরাচোমরারা প্যাসেজের শেষে ঠিক ছাদের সামনে ওই অভ্যাগত কক্ষে বসে ছিলেন। যখন সে আপনাদের মধ্যে গিয়ে পড়েছে হেঁটেছে পরিচারকদের মত দ্রুতগতিতে - মাথা নিচু, ঝাপটাচ্ছে ন্যাপকিন আর ছুটছে পা। দৌড়ে সে ছাদে পৌঁছে গেল। টেবিল ক্লথে কিছু একটা করল, তারপর দৌড়ে ফেরৎ গেল অফিস আর ভৃত্যমহলের দিকে। কিন্তু অফিসের কেরাণী আর পরিচারকদের দৃষ্টির আওতায় সে হয়ে উঠল অন্য মানুষ, পাল্টে গেল তার দেহভঙ্গী। উদ্ধত ভঙ্গীতে অন্যমনস্কভাবে হেঁটে বেড়াল খিদমদ্গারদের মাঝে। অতিথিদের এমনভাবে চলতে দেখতে অভ্যস্ত তারা - ডিনার পার্টির কোন ফুলবাবুর সারা বাড়িময় পিঞ্জরাবদ্ধ শ্বাপদের মত হেঁটে বেড়ানোটা নতুন কিছু নয় তাদের কাছে। তারা জানে সৌখীন বড়মানুষদের স্বভাবই হল যথেচ্ছা হেঁটে বেড়ানো। প্যাসেজে বেড়ানো শেষ হলে সে আবার পেছনে ঘুরে ফেরৎ গেল অফিসের পাশ দিয়ে। আর সেটা পার হয়ে ওই খিলানটার ছায়ায় সে যেন পাল্টে গেল কোন যাদুমন্ত্রে। আজ্ঞাবহ দাস হয়ে দ্রুত লয়ে হেঁটে গেল ধীবরদের মাঝখান দিয়ে। অভ্যাগত ভদ্রলোকরা কেনই বা একটা সাধারণ পরিচারককে নিয়ে মাথা ঘামাবেন ? পরিচারকরাই বা কেন একজন

সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে সন্দেহ করবে? দু-একটা মজার চাতুরিও করল সে - মালিকের ঘরে গিয়ে জোর গলায় হাঁক দিল সোডার জল চেয়ে, তার নাকি পিপাসা পেয়েছে। তারপর অমায়িকভাবে বলল সে নিজেই সেটা নিয়ে যাবে। চটপট করে আপনাদের ভিড়ের মাঝখান দিয়ে নিয়ে গেল তাই - যেন ব্যস্ত এক পরিচারক। এ ছলনা অবশ্য বেশীক্ষণ জারি রাখা যেত না, কিন্তু কাজ হাসিল করার জন্যে মাছের পদটির শেষ হওয়া অবধি এরকম চালিয়ে যেতে পারলেই যথেষ্ট ছিল।

তার পক্ষে সবচেয়ে বিপজ্জনক মুহূর্ত ছিল, যখন এল, যখন পরিচারকরা দেওয়ালের গায়ে সার দিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু সে এমন কায়দা করে এককোনে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল যে অল্পসময়টুকুর জন্যে পরিচারকরা তাকে ভদ্রলোক ভাবল আর ভদ্রলোকেরা তাকে ভাবলেন বেয়ারা। তারপরের সময়টুকু কেটে গেলো অতি সহজে। টেবিল থেকে দুরে কোন পরিচারকের চোখে সে যদি কখনো পড়ল, তাহলে পরিচারককে দেখল একজন অলস অভিজাত ভদ্রলোককে। মাছের থালা সরানোর দুমিনিট আগে তাল মিলিয়ে সে হয়ে গেল দক্ষ বেয়ারা। থালাগুলো একটা বাসনের তাকের ওপর রাখল নামিয়ে। ছুরিচামচগুলো ঢোকাল বুকপকেটে, তাতে পকেট গেল ফুলে। তারপরে হরিণের বেগে দৌড় লাগালো ক্লোকরুম অবধি - এই সময়েই আমি পেয়েছিলাম তার পায়ের আওয়াজ। ক্লোকরুমের কাছে আবার ভোল পাল্টে সে হল বনেদী ভদ্রলোক, যেন চলে যাচ্ছেন কোন জরুরী কাজ পড়াতে। এরপর বাকী রইল শুধু ক্লোকরুমের আর্দালীকে টিকিটটি দেওয়া, আর তারপর ফুলবাবু সেজে যেমন এসেছিল তেমনি বেরিয়ে যাওয়া। অসুবিধের মধ্যে শুধু ক্লোকরুমের আর্দালীটি ছিলাম আমি।

- তারপর কি করলেন তাকে? উত্তেজিতভাবে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন কর্নেল - কি বলল সে আপনাকে?

- মাপ করবেন - অবিকারভাবে বললেন ফাদার ব্রাউন - আমার কাহিনী এখানে শেষ।

- এবং নতুন একটির সূচনা - বিড়বিড় করে বললেন কর্নেল -সে লোকটার কর্মকুশলতা তো বুঝতে পারলাম। কিন্তু আপনারটা ধরতে পারি নি এখনো।

- চলি, এবার যেতে হবে। বললেন ফাদার ব্রাউন।

প্যাসেজ দিয়ে দুজনে এগিয়ে এলেন বাইরের হলঘরটা অবধি। চোখে পড়ল ডিউক অফ চেস্টারের তাজা মেচেতা পড়া মুখখানা - স্ফূর্তিতে লম্বা লম্বা পায়ে তিনি আসছেন তাঁদের দিকেই।

- এসো হে পাউন্ড - প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বললেন তিনি - তোমাকে এতক্ষণ সবজায়গায় খুঁজে বেড়াচ্ছি। ডিনার তো আবার দারুণ জমে উঠেছে। হারানো ছুরিচামচ পুরুদ্ধারের সুবাদে অডলেকে এবার একটা বক্তৃতা দিতে হবে। তাছাড়া ঘটনার সম্মানে আমরা কোন নতুন আচারও চালু করতে চাই। তুমি তো ওগুলো ফেরৎ নিয়ে এলে - তুমিই একটা কিছু বাতলাও না।

ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে তাঁর দিকে দেখলেন কর্নেল। বললেন,

- আমি বলি কি, এবার থেকে আমরা কালোর বদলে সবুজ কোট পড়ব। নাহলে কে জানে আমাদেরকে লোকে বেয়ারা বলে ভাবলে আবার কোথাকার কি ভুলচুক হবে

- দুর! বললেন তরুণ ডিউক - ভদ্রলোকদের আবার বেয়ারার মত দেখায় নাকি?

- আর বেয়ারাদেরও বোধহয় ভদ্রলোকের মতন দেখায় না! বললেন কর্নেল, মুখে তাঁর তখনো ব্যঙ্গের হাসি - রেভারেন্ড সাহেব, আপনার বন্ধুটি নিশ্চই অতিশয় প্রতিভাবান। না হলে কি আর এত সহজে ভদ্রলোক সাজতে পারত?

বাইরে ঝড়ের রাত, তাই তাঁর অতি সাধারণ ওভারকোটখানা গলা অবধি তুলে এঁটে ফেললেন ফাদার ব্রাউন। স্ট্যান্ড থেকে তুলে নিলেন অতি সাধারণ ছাতাখানা।

- হ্যাঁ তাতো বটেই - বললেন তিনি - ভদ্রলোক হওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। কিন্তু আমার জানি কেমন কখনো কখনো মনে হয় বেয়ারা হওয়া আরো কষ্টের।

'গুড ইভনিং' সম্ভাষণ করে সেই বিলাসভবনের গুরুভার দরজা খুলে বেরোলেন তিনি। পেছনে তাঁর বন্ধ হয়ে গেল সে সোনার ফটক। রাতের জলসিক্ত অন্ধকার রাস্তায় চললেন তিনি সস্তার বাসের সন্ধানে।

—— x ——

উড়ন তারা

বুড়ো বয়সে সাধু হয়ে ফ্ল্যাম্বো বলত।

- কাকতলীয় কিনা জানি না। কিন্তু আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর অপরাধটাই আমার সর্বশেষ অপরাধ। সে অপকর্মটা করেছিলাম আমি ক্রিসমাসের সময়। আমি শিল্পী, যেখানে থাকতাম বদমায়েশি করতাম সেখানকার মরশুম আর প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে তাল রেখে। বিপর্যয় ঘটানোর জন্যে বেছে নিতাম তার সাথে মানানসই শ্রেনীর লোককে। যেমন ধরুন জমিদারদের ঠকানোর পক্ষে শ্রেষ্ঠ জায়গা হল ওক কাঠে মোড়া লম্বা কামরা। আবার ইহুদীদের সর্বস্বান্ত করা উচিত কাফে রিশের আলোর নিচে।

তারপর আবার ইংলন্ডে যদি কোন উচ্চপদাসীন যাজকের পয়সা লোপাট করতে চাইতাম (করা খুব সোজা নয়) তাহলে তাঁকে হয়ত ফাঁসাতাম কোন গীর্জার শহরের সবুজ ঘাসে ঘেরা ধূসর টাওয়ারের তলায়। আবার ফ্রান্সে যদি কোন পয়সাওলা, পাজী, গ্রাম্য গৃহস্থের থেকে পয়সা আদায় করতে চাইতাম (করা প্রায় অসম্ভব) তাহলে হয়ত তার মাথা মোড়াতাম গলের ভাবগম্ভীর সমভূমির পাতা ছাঁটা পপলারের ধূসর সারির নিচে।

আমার শেষ অপরাধটা বড়দিনের অপরাধ। উষ্ণ, খোশমেজাজী, স্বচ্ছল ইংরেজ ঘরানার একেবারে ডিকেন্সীয় পরিবেশের অপরাধ। পাটনীর কাছে একখানা পুরনো বর্ধিষ্ণু বাড়িতে করেছিলাম আমার সেই কুকীর্তি। বাড়ির সামনে একফালি বাঁকা চাঁদের মত ঘোড়ার গাড়ি যাবার রাস্তা, তারপাশে অশ্বশালা, জোড়া ফটকে লেখা নাম। নিশ্চই আন্দাজ করতে পারছেন আমার দুষ্কর্মের প্রেক্ষাপট, নিপুণ, কাব্যময় অনুসরণ করেছিলাম ডিকেন্সের। কিন্তু দু:খের কথা আর কি বলব, সে সন্ধ্যের মধ্যেই কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করতে হল।

এরপর ফ্ল্যাম্বো বোঝাতে আরম্ভ করল নেপথ্যের কাহিনী। নেপথ্য থেকে জেনেও সে কাহিনী অতি বিচিত্র, আর বহিরঙ্গ তো একেবারেই অবোধ্য। কিন্তু তবু আমাদের মতো আগন্তুকদের বাইরেই থেকে দেখতে হবে তা।

এইভাবে দেখলে বক্সিং দিবসের সন্ধ্যেবেলা যখন একটি তরুণী বাড়ির দরজা খুলে পাখিদের রুটি খাওয়াতে বাগানে পদার্পণ করল নাটকের সূত্রপাত

তখন থেকেই। তরুনীর মুখখানি সুন্দর, বাদামী চোখজোড়া নি:শঙ্ক। কিন্তু তার চেহারার আর বিশেষ কিছু বোঝা মুস্কিল। কারণ লোমশ বাদামী পোযাকে তার আপাদমস্তক এমন ঢাকা যে বোঝার উপায় নেই যে কোনটা তার চুল আর কোনটা পোযাক। তার সুশ্রী মুখখানা দেখা না গেলে তাকে ছোটখাট একটা ভাল্লুকই বলে মনে হত।

শীতের বিকেল রক্তিম হয়ে নেমে আসছে সন্ধ্যা। তার লোহিতচ্ছটা কুসুমহীন পুষ্পমালঞ্চে এনেছে অতীত গোলাপের স্মৃতি। বাড়ির একপাশে অশ্বশালা। অন্যপাশে জলপাই গাছে ছাওয়া উদ্যানপথ এগিয়ে গেছে পেছনের বড় বাগানের দিকে। পাখির খাবার ছড়ানো শেষ করে স্বচ্ছন্দ গতিতে তরুনী এগিয়ে গেল সেই পথ দিয়ে — পৌছল পেছনের চির শ্যামল গাছের অনুজ্জ্বল উপবনে। উঁচু পাঁচিলে চোখ তুলে শব্দ করল বিস্ময়ের, কে জানে সত্যি না কপট, কারণ পাঁচিলে সওয়ারের ভঙ্গীতে বসে এক বিচিত্র মূর্তি। বুঝিবা বিপদের আশঙ্কাতেই বলল তরুণী

- লাফাবেন না মিঃ ক্রুক, পাঁচিলটা বড্ড উঁচু।

পক্ষীরাজের সওয়ারের মত দেওয়ালে বসা ব্যক্তি দীর্ঘদেহী কৃশাঙ্গ তরুণ। মাথার কৃষ্ণবর্ণ চুল বুরুশের মত খোঁচা খোঁচা। মুখশ্রীতে ছাপ বুদ্ধিমত্তার, খানিক প্রতিষ্ঠারও। কিন্তু গাত্রবর্ণ বিজাতীয় রকমের বিবর্ণ এবং তা আরো প্রকট হয়েছে পরণের লাল টাইটির জন্য। পরিচ্ছদের মধ্যে একমাত্র এইটির চেহারাই খানিক পরিচ্ছন্ন, কে জানে হয়তো বা কিছুর প্রতীক হবে। তরুণীর সশঙ্ক অনুরোধ অগ্রাহ্য করে পা ভাঙার সম্ভাবনা সত্ত্বেও ফড়িঙের মত তার পাশে লাফিয়ে নেমে পড়লেন তিনি। শান্ত কণ্ঠে বললেন,

- আমার বোধহয় চোর হওয়া উচিত ছিল। ওপাশের ওই সুন্দর বাড়িটাতে না জন্মালে হতামও বোধহয় তাই। অবশ্য হলে বোধহয় ক্ষতি হত না কিছু।

- এ রকম কথা বলেন কি করে? প্রতিবাদ করল তরুণী।

- দেখুন - বললেন তরুণটি - না হয় পাঁচিলের ভুল দিকেই জন্মেছি। কিন্তু তাই বলে পাঁচিল ডিঙোনাটা যে কি করে অন্যায় হয় তা বুঝতে পারি না।

- আপনি কখন যে কি করবেন আর কখন যে কি বলবেন, কিচ্ছু বুঝতে

পারি না, বলল তরুণী।

- আমি নিজেই মাঝে মধ্যে বুঝতে পারি না - উত্তর দিলেন মি: ক্রুক - কিন্তু সে যাই হোক এখন অন্তত আমি দেওয়ালের ঠিক দিকেই আছি।

- পাঁচিলের ঠিক দিক কোনটা? মৃদু হেসে প্রশ্ন করল তরুণী।

- যে দিকে আপনি আছেন। উত্তর দিলেন ক্রুক নামের তরুণটি।

দুজনে মিলে জলপাই গাছের উদ্যান পথ দিয়ে সামনের বাগানের দিকে আসতে আসতে পরপর তিন তিনবার শোনা গেল গাড়ির হর্ণ, প্রতিটি আওয়াজ আরো নিকটে। দ্রুতগতি, সৌখীন হাল্কা সবুজ রঙের একখানা গাড়ি প্রায় পাখির বেগে দরজায় এসে থামল। ধ্বক ধ্বক করে চলতে থাকল তার ইঞ্জিন।

- আরে, আরে - বললেন লাল টাই পরা তরুণ - এতো দেখছি পাঁচিলের ঠিক দিকে জন্মানো কেউ। মিস অ্যাডামস, আপনার সান্টাক্লসটি যে এতো আধুনিক তা তো জানতাম না।

- ও: উনি তো আমার ধর্মপিতা, স্যার লিওপোল্ড ফিশার। বক্সিং দিবসে প্রতিবারই আসেন।

সরল মনেই খানিক্ষণের জন্যে চুপ করে গেল রুবি অ্যাডামস। তার অজ্ঞাতসারেই বোঝা গেল তার উৎসাহের অভাব। বলল,

- উনি খুব দয়ালু।

এই নামজাদা মাননীয় ব্যক্তিটির কথা আগেই শুনেছে সাংবাদিক ক্রুক। অবশ্য তিনি যে ক্রুকের কথা আদৌ শোনেননি সেটা তার দোষ নয়। কারণ দি ক্ল্যারিয়ন বা দি নিউএজে তার লেখা কয়েকখানা প্রবন্ধে স্যার লিওপোল্ডের ওপর কড়া টিপ্পনীর কমতি ছিল না। কিন্তু কিছু না বলে সে কঠোর দৃষ্টিতে গাড়ি থেকে মাল নামানোর দীর্ঘ প্রক্রিয়া লক্ষ্য করতে লাগল। গাড়ির সামনে থেকে আর্বিভাব হল একটি পরিচ্ছন্ন, বড়সড়, সবুজ উর্দী পরা ড্রাইভারের এবং পেছন থেকে আর্বিভাব হল একটি পরিচ্ছন্ন, ধূসর উর্দী পরা খানসামার। দুজনে মিলে প্রথমে স্যার লিওপোল্ডকে একরকম দোরগোড়ায় প্রতিষ্ঠা করে ফেলল। তারপর এক এক করে তাঁর মোড়ক ছাড়াতে আরম্ভ করল। যেন তিনি সযত্নে মোড়া কোন

পার্শেল। এক এক করে খুলে এল রাশি রাশি চাদর, পশুলোমের পোষাক আর রঙবেরঙের স্কার্ফ। ক্রমশঃ প্রকাশ পেল একটি মনুষ্যমূর্তি — বন্ধুবৎসল, বিদেশী চেহারার বৃদ্ধ ভদ্রলোক। মুখে একগাল হাসি আর ছাগুলে দাড়ি। ঘসছেন বিশাল লোমশ দস্তানায় মোড়া হাত দুখানি।

কিন্তু এনার চেহারা পুরোপুরি দৃষ্টিগোচর হওয়ার বেশ আগেই খুলে গিয়েছিল বাড়ির দরজা এবং মাননীয় অতিথিকে আপ্যায়ন করে ভেতরে নিয়ে যাবার জন্যে বেরিয়ে এসেছিলেন ক্যাপ্টেন অ্যাডমস — পশুলোমের পোষাক পরা তরুণীর পিতা। দীর্ঘাঙ্গ, রোদেপোড়া চেহারার মিতভাষী পুরুষ, মাথায় ফেজের মত আঁটা লাল ধূমপানের টুপি, যেন মিশরের ইংরেজ সর্দার বা পাশা। সঙ্গে কানাডা থেকে সদ্য আগত সমন্ধী জেমস ব্লাউন্ট — হলুদ দাড়িতে শোভিত হুল্লোড়ে যুবা ভদ্র কৃষক এবং প্রতিবেশী রোমান চার্চের একটি নিতান্তই মামুলী পাদ্রী। কর্নেলের স্বর্গগতা স্ত্রী ছিলেন ক্যাথলিক, আর যেমনটি সাধারণতঃ হয়ে থাকে, তাঁর পুত্রকন্যারাও পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে মাতার, পাদ্রী মশায়ের সব কিছুই অতি সাধারণ, এমনকি তাঁর ব্রাউন নামখানা পর্যন্ত। কিন্তু তবু কে জানে কেন, কর্নেল বড়ই পছন্দ করেন তাঁর সাহচর্য এবং প্রায়ই আমন্ত্রণ করে থাকেন এ ধরণের পারিবারিক জমায়েত।

বাড়িতে ঢোকার মুখের হলঘরখানা বেশ বড়, স্যার লিওপোল্ডের বস্ত্র বিমোচনের পক্ষে যথেষ্ট। একদিকে তার বাড়ির সামনের দরজা, আর উল্টোদিকে সিঁড়ি। সেই হলের ফায়ার প্লেসের সামনে, যার ওপর টাঙানো কর্ণেলের তলোয়ার সমাধা হল বাকি কাজটুকু। কৃশাঙ্গ ক্রুক সমেত বাকি সবাইয়ের পরিচয়ও করিয়ে দেওয়া হল স্যার লিওপোল্ড ফিশারের সাথে। ধনকুবের ভদ্রলোকটি ততক্ষণ তাঁর কাপড়চোপড় হাঁতড়াচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত টেলকোটের কোন এক নিভৃত জেব থেকে খুঁজে বের করলেন একটা ডিম্বাকৃতি কালো কৌটো। আনন্দোজ্জ্বল মুখে সবাইকে জানালেন সেটা তাঁর ধর্মকন্যার বড়দিনের উপহার। তারপর অকপট অহমিকায় অথচ সরলভাবেই সবার সামনে তুলে ধরলেন কৌটো, খুলে ফেললেন অল্প ছোঁয়ায়। আলোর ফোয়ারায় ঝলসে গেল সবার চোখ — কৌটোর কমলা রঙের ভেলভেটের বাসায় রাখা তিন তিনটে অত্যুজ্জ্বল সাদা হীরে। তাদের রোশনাই বুঝিবা আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে হাওয়াতে। সদাশয় আনন্দোজ্জ্বল মুখে দাঁড়িয়ে ফিশার মশাই উপভোগ করতে লাগলেন তরুণীর বিস্ময় বিহ্বলতা আর



সবার সামনে তুলে ধরলেন কৌটো, আলোর ফোয়ারায় ঝলসে গেল সবার চোখ।

আনন্দোচ্ছ্বাস, কর্নেলের আড়ষ্ট প্রশংসা আর কর্কশ কণ্ঠের ধন্যবাদ, আর বাকি সবার বিস্ময়।

- এটা এখন তুলে রাখি গো - পকেটে কৌটোটা ঢোকাতে ঢোকাতে বললেন ফিশার — এটাকে খুব সাবধানে নিয়ে আসতে হয়েছে। এ তিনটে আফ্রিকান হীরে এতবার চুরি হয়েছে যে এগুলোর নামই হয়ে গেছে উড়ন তারা। যত বড় বড় অপরাধীরা সর্বদা ধাওয়া করছে এর পেছনে। পথেঘাটের বদমায়েসরাও এটা হাতাতে পিছপা নয়। আনতে আনতে এটা রাস্তায় খোয়া যাওয়া কিছু অসম্ভব ছিল না।

- খুবই সম্ভব ছিল - ঝাঁঝিয়ে উঠল লাল টাই পরা ক্রুক - হাতিয়ে নিলেও আমি তাদের দোষ দিতাম না। তাদের ক্ষিধের সময় আপনারা যখন এককুচি পাথরও দেন না। তখন তারা আপনার পাথর হাতাবে না তো কি করবে।

উত্তেজিত হয়ে উঠল তরুণী। বলল

- খবর্দার ওরকম কথা বলবেন না। যবে থেকে আপনি যে ওই কি একটা হয়েছেন না, তবে থেকে আপনি শুধু এইরকম কথাবার্তা শুরু করেছেন। আপনারা বুঝতেই পারছেন কি বলছি চাইছি আমি। যারা সব ঝাড়ুদারদেরও গলা জড়াতে

চায় তাদের কি বলে যেন?

- সাধু সন্ত। বললেন ফাদার ব্রাউন।

উন্নাসিক হাসি হেসে স্যার লিওপোল্ড বললেন,

- রুবি বোধহয় বলতে চাইছে সমাজবাদী।

- উর্দারপন্থী বলতে যারা স্রেফ মূলো খেয়ে বেঁচে থাকে, তাদেরকে বোঝায় না — অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল ক্রুক — রক্ষণপন্থী বলতেও বোঝায় না তাদের যারা জ্যাম বানায়। আপনাদের আমি হলফ করে বলতে পারি যে সবাজবাদীরা ঝাড়ুদারদের সঙ্গে সন্ধ্যেবেলা সামাজিকতা করে না। সমাজবাদীদের দাবি এইটুকু যে ঝাড়ুদাররা ঝাড়ু সুষ্ঠুভাবেই দিক এবং তার জন্যে যথার্থ পারিশ্রমিক তাদের দেওয়া হোক।

- কিন্তু তারা ধুলোকাদা পর্যন্ত কারোর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বলে স্বীকার করে না। অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন ফাদার ব্রাউন।

যুগপৎ কৌতূহল এবং শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাল ক্রুক, বলল,

- কেউ কি ধুলোকাদার মালিক হতে চায়?

- চাইতেই পারে - বললেন ফাদার ব্রাউন। দুচোখে তাঁর কল্পনার রঙ - একবার বড়দিনের্র সময়ে যাদুকর না আসাতে ধুলোকাদা মেখে ছ-ছটা বাচ্চাকে মাতিয়ে রেখেছিলাম।

- দারুণ! চেঁচিয়ে উঠল রুবি - এখানেও করবেন নিশ্চই।

হুল্লোড়ে কানাডিয়ান ব্লাউন্ট আর বিস্ময় চকিত ধনকুবের ফিশার দুজনেই কি বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় করাঘাতের শব্দ হল সামনের জোড়া দরজায়। দরজা খুলে দিলেন পাদ্রীমশাই। দেখা গেল নীললোহিত রাজসিক সূর্যাস্ত আর ক্রমান্ধকার চিরশ্যামল বৃক্ষশ্রেনী। রঙ্গমঞ্চের বর্ণময় মনোরম প্রেক্ষাপটের মত এহেন প্রাকৃতিক শোভায় মুগ্ধ হয়ে মুহুর্তের জন্যে সবাই ভুলে গেল দরজায় দাঁড়ানো নিতান্তই চেহারার লোকটিকে। ধূলি ধূসরিত চেহারা তার, পরণে জীর্ণ কোট। স্পষ্টতঃই কোন মামুলী বার্তাবাহক। ইতস্তত: ভাবে একখানা চিঠি বাড়িয়ে ধরে বলল,

- কর্তাদের মধ্যে মি: ব্লাউন্ট কেউ আছেন নাকি?

চমকে উঠলেন মি: ব্লাউন্ট। চেঁচিয়ে সম্মতি জানাতে গিয়েও থেমে গেলেন, অতীব বিস্ময় নিয়ে খামখানা ছিঁড়ে ফেলে পড়ে ফেললেন চিঠি। মুখে তাঁর অল্পক্ষণের জন্যে চিন্তার কালো মেঘ দেখা দিয়েও কেটে গেল সাথে সাথে। ভগ্নীপতির দিকে তাকিয়ে বললেন,

- বার বার আপনার ঝামেলা বাড়াতে খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু আজ রাতে আমার একজন পুরনো পরিচিত লোক কাজের ব্যাপারে আমার সঙ্গে এখানে দেখা করতে আসে তাহলে কিছু মনে করবেন কি? আসলে বিখ্যাত ফরাসী ব্যায়ামবিদ এবং কৌতুক অভিনেতা ফ্লোরিয়ানই আসতে চাইছেন এখানে। জন্মে উনি তো ফরাসী কানাডিয়ান, তাই পশ্চিমে চিনতাম ওঁকে কয়েকবছর আগে। উনি আমার সঙ্গে নাকি কি একটা কাজের ব্যাপারে দেখা করতে চান। কাজটা যে কি সেটা অবশ্য বিন্দুমাত্র আন্দাজ করতে পারছি না।

- নিশ্চই, নিশ্চই - অক্লেশে বললেন কর্নেল - আরে তোমার বন্ধু বলে কথা! সেও নিশ্চই জমিয়ে দেবে।

হাসতে হাসতে ব্লাউন্ট বললেন,

- মানে বলছেন মুখে কালি মেখে সঙ সাজবে! তাতো করবেই, আপনাদেরও ছাড়বে না। আমার তাতে অবশ্য কোন অসুবিধে নেই। আমি মশাই খুব একটা রুচিবাগীশ নই। ঘরোয়া প্যান্টোমাইম যাত্রা, যাতে লোকে টুপির ওপর বসে পড়ে, সেইসবই আমার পছন্দ।

- দয়া করে আমারটার ওপর বসবেন না! হামবড়াভাবে বললেন লিওপোল্ড ফিশার।

- আরে, আরে ঝগড়া করবেন না - প্রায় উড়িয়ে দিল ক্রুক - টুপির ওপর বসার চাইতেও স্থূল রসিকতা আছে।

বিদ্বেষপূর্ণ সব মতামত আর সুন্দরী ধর্মকন্যাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, দুয়ের কারণেই লাল টাই পরা ক্রুক মশাই ক্রমশ: চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিল লিওপোল্ড ফিশারের। সুতরাং প্রায় বিচারকের ভঙ্গীতে ব্যঙ্গোক্তি করলেন তিনি।

- যেমন ধরুন টুপিটা আপনার ওপর বসানো।

- আরে, আরে, আরে — একরকম গ্রাম্য উদারতার ভঙ্গীতে চেঁচিয়ে উঠলেন ব্লাউন্ট — এমন সুন্দর সন্ধ্যেটা নষ্ট করবেন না। বরং বলি কি, আসুন সবাই মিলে কিছু করা যাক। সেরকম অপছন্দ হলে মুখে কালি মাখার বা টুপির ওপর বসার দরকার নেই। কিন্তু ওই ধরণেরই কিছু করা যেতে পারে। একটা পাক্কা ইংরেজ ঘরাণার প্যান্টোমাইম যাত্রাই করা যাক না কেন - ক্লাউন, কলম্বিন এসব নিয়ে? বারো বছর বয়সে ইংলন্ড ছাড়ার আগে একবার একখানা দেখেছিলাম। সে স্মৃতি আমার মনের মধ্যে এখনো জ্বলজ্বল করছে। কিন্তু স্বদেশে ফিরে দেখি সে সব জিনিষ অদৃশ্য হয়ে গেছে। আজকাল হয় যত সব ছিঁচকাঁদুনে পরী কাহিনীর নাটক। কোথায় আমার পছন্দের জিনিষ হল পুলিশকে ডান্ডাপেটা করে সসেজ বানানো, আর দেখাবে যত জ্যোৎস্নালোকে রাজকন্যার উপদেশামৃত বর্ষণ। নাম নাকি নীল পাখি। নীল পাখির চাইতে আমার নীল দাড়ি আঁটা প্যান্টালুনের চরিত্রই বেশী পছন্দ।

- পুলিশ পিটিয়ে সসেজ বানানোতে আমারও সায় আছে - বলল জন ক্রুক - সমাজবাদের এর চাইতে ভালো বর্ণনা এর আগে আর শুনিনি। কিন্তু সাজ পোষাক যোগাড় করাটা বেশ ঝঞ্ঝাটের।

- মোটেই না - সোৎসাহে বললেন ব্লাউন্ট - সবচেয়ে সোজা হল হার্লেকুইন সাজা। দুটো কারণের জন্যে। প্রথমত: যথেচ্ছ চ্যাংড়ামি করা যায়। দ্বিতীয়ত: সব গেরস্থালির জিনিষপত্র ব্যবহার করা চলে - যেমন টেবিল, তোয়ালের আলনা, কাপড় কাচার ঝুড়ি।

পায়চারী করতে করতে সোৎসাহে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল ক্রুক।

- তা বটে। কিন্তু আমার কাছে তো পুলিশের উর্দী নেই। তা অনেকদিন হয়ে গেল পুলিশ মারিনি কিনা।

ভ্রু কুঁচকে অল্পক্ষণ ভাবলেন ব্লাউন্ট। তারপর উরুতে চাপড় মেরে বললেন,

- তাতে অসুবিধে নেই। এই চিঠিতে ফ্লোরিয়ানের ঠিকানা আছে। আর সে লন্ডনশুদ্ধু সমস্ত নাটকের পোষাকওয়ালাদের চেনে, আমি তাকে ফোন করে বলে দিচ্ছি আসার সময় একটা পুলিশের পোষাক নিয়ে আসতে।

লাফ মেরে চললেন তিনি টেলিফোনের দিকে।

- ও দারুণ হবে গো ধর্মবাবা - প্রায় নাচতে নাচতে বলল রুবি - আমি কলম্বিন সাজব আর তুমি হবে প্যান্টালুন।

সিঁটিয়ে গেলেন কোটিপতি। গম্ভীরভাবে বললেন,

- সোনা, তুমি বরং অন্য কাউকে প্যান্টালুন সাজতে বল।

- আপনারা চাইলে আমি প্যান্টালুন সাজতে পারি। মুখ থেকে সিগার নামিয়ে বললেন কর্নেল অ্যাডামস।এ ব্যাপারে তাঁর এই প্রথম এবং শেষ মন্তব্য।

- আপনার তো পাথরের মূর্তি সাজা উচিত। টেলিফোন সেরে ফিরতে ফিরতে হাসিমুখে বললেন ব্লাউন্ট - সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে। মিঃ ক্রুক ক্লাউন সাজবেন। উনি সাংবাদিক মানুষ, নানা পুরনো রসিকতা সব জানেন। আমি হার্লেকুইন সাজব, তাতে স্রেফ লম্বা ঠ্যাঙে লাফানোর দরকার হয়। আমার বন্ধু ফ্লোরিয়ান ফোনে বলল সে পুলিশের পোষাক নিয়ে রওয়ানা দিচ্ছে, পথেই পাল্টে নেবে। আমাদের যাত্রা এই হলঘরেই হবে। দর্শকরা সব ওই চওড়া সিঁড়ির ওপর একের পর এক ধাপে সার দিয়ে বসবে। দরজাটা পেছনের প্রেক্ষাপট হবে — হয় খোলা, না হয় বন্ধ। বন্ধ অবস্থায় পাবেন ইংরেজ অন্দরমহল। আর খোলা হলে পাবেন জ্যোৎস্নায় ঢাকা বাগান। সব যাদুর মত হবে।

পকেট থেকে একটা চকখড়ি বের করে হলঘর ধরে দৌড়লেন ব্লাউন্ট, দরজা আর সিঁড়ির মাঝামাঝি ফুটলাইটের অবস্থানটা মার্কা দিয়ে দিতে।

খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে যে কি করে এহেন অলীক আড়ম্বরের আয়োজন সমাধা হয়ে গেল সে এক প্রহেলিকা। গৃহের কোন এক তারুণ্যের ছোঁয়ায় বেপরোয়া পরিশ্রমে হাত লাগাল সবাই। অলক্ষ্যে থেকে গেল কেবল দুটি মুখ আর হৃদয় যা এই যৌবন জোয়ারের উৎস। মধ্যবিত্তের রীতিনীতির নিস্তেজ বেড়া টপকে বল্গাহীন কল্পনার দৌড়ের গতিবেগ ক্রমশ উঠল বেড়ে। বসার ঘরের ল্যাম্পশেডকে ঘাগরা বানিয়ে নয়নাভিরাম সেজে উঠল কলম্বিন। প্যান্টালুন আর ক্লাউন সাজের জন্য রাঁধুনীর থেকে যোগাড় করে ফেলল ময়দা, নেপথ্য থেকে আর কোন গৃহভৃত্য যোগাল লাল রুজ। সিগারের বাক্সের রাঙতা জড়িয়ে তারপর হার্লেকুইন জহরতের খোঁজে ছুটল ভিক্টোরিয় ঝাড়বাতিটার দফা সারতে - বহু কষ্টে নিবারণ করতে

হল তাকে। কোন পুরনো প্যান্টোমাইম যাত্রায় রুবি হীরক রানী সেজেছিল, তার সে পোষাকের নকল জহরত দিয়ে এ যাত্রা সামাল দেওয়া গেল হার্লেকুইনকে। সত্যি বলতে কি, রুবির জেমস ব্লাউন্ট মামাটি আহ্লাদে একেবারে দিশেহারা। কোত্থেকে একটা কাগজের গাধার মাথা পর্যন্ত ফাদার ব্রাউনকে পরিয়ে দিলেন। ফাদার ব্রাউন অবশ্য তা নির্বিবাদে সহ্য করলেন। এমন কি কোন গোপন কায়দায় নিজের কান নাচিয়ে তাক লাগিয়ে দিলেন সবাইকে। ক্রুকের গলায় মনোযোগ দিয়ে সসেজের মালা পরাতে পরাতে রুবি বলল,

- মামা একেবারে অদ্ভুত! এমন পাগলামি করে কেন কে জানে?

- আপনি কলম্বিন আর উনি হার্লেকুইন - বলল ক্রুক - আমি তো স্রেফ ক্লাউন, যত বস্তাপচা রসিকতা করব।

- বরং আপনি হার্লেকুইন হলেই আমার বেশী ভাল লাগত। বলে রুবি বিদায় নিল গলায় সসেজের মালাখানা দুলিয়ে দিয়ে।

ফাদার ব্রাউন নেপথ্যের সমস্ত খুঁটিনাটি জানেন, এমনকি একটা বালিশকে যাত্রার শিশু বানিয়ে হাততালি পর্যন্ত কুড়িয়েছেন। কিন্তু সামনে গিয়ে দর্শকদের মধ্যে এমনভাবে বসলেন, যেন কোন কিশোর তার জীবনের সর্বপ্রথম নাটকটি দেখতে এসেছে। দর্শকের সংখ্যা অবশ্য বেশী নয় — আত্মীয়স্বজন, দু একজন স্থানীয় বন্ধুবান্ধব আর গৃহের ভৃত্যজন। সামনের সারিতে বসলেন স্যার লিওপোল্ড ফিশার। তাতে পশুলোমের কলার আঁটা বিশাল চেহারায় কিছু ব্যাহত হল পেছনে বসা ক্ষুদে পাদ্রীর দৃষ্টি। কিন্তু আদৌ কোন কিছু পাদ্রীমশায়ের দৃষ্টি এড়িয়েছিল কিনা, তা নিয়ে গুণীজনের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে।

পুরো প্যান্টোমাইমটি অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হলেও কারোর অপছন্দ হলনা। দেখা গেল তাতে উদ্ভাবনী শক্তির প্রচুর প্রকাশ যার প্রধান উৎস ক্রুক। এমনিতে সে যথেষ্ট বুদ্ধিমান। তার ওপর মনের মানুষের মুখে মুহূর্তের জন্যে একটি বিশেষ ভাবের প্রকাশ দেখা তরুণের সবজান্তাভাব আর দুনিয়াদারির অতীত এক নির্বুদ্ধিতায় আজ সে অনুপ্রাণিত। শুধু ক্লাউন সাজলে কি হবে। বাকি সব কাজও সারল সে অবলীলায় - কাহিনী রচনা (যেটুকু সামান্য কাহিনী ছিল আর কি), প্রেক্ষাপট আঁকা, প্রেক্ষাপট সরানো, এমনকি নেপথ্য সঙ্গীত, সবেতেই পাওয়া গেল তাকে। সেই আষাঢ়ে অভিনয়ের পদে পদেই ক্লাউনের পোষাক গায়ে পিয়ানোর ওপর প্রায় লাফিয়ে পড়ে তুলতে লাগল কিম্ভূত অথচ সময়োচিত

কোন সঙ্গীতের ঝড়।

কাহিনীর তুঙ্গে খুলে গেল প্রেক্ষাপটের জোড়া দরজা। চন্দ্রালোকিত বাগানের দৃশ্যপটে আরো পরিস্ফুট হয়ে দেখা দিলেন আজকের কুশলী অতিথি — পুলিশের পোষাকে প্রথিতযশা ফ্লোরিয়ান স্বয়ং। পিয়ানোয় বসা ক্লাউন মশাই সাথে সাথে সুর তুললেন 'পেনজান্সের জলদস্যু'। কিন্তু বিখ্যাত কৌতুকাভিনেতাটির সঠিক অথচ অনাড়ম্বর পুলিশি চালচলনের সম্বর্ধনায় ডুবে গেল সে সুর। হার্লেকুইন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এক ঘা বসিয়ে দিল হেলমেটে — পিয়ানোয় তখন বাজছে 'কোথায় পেলে তব শিরোভূষণ'। কপট বিস্ময়ের সুসফল অভিনয়ে পুলিশমশাই সে দিকে ফিরতেই হার্লেকুইন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বসিয়ে দিল আর এক ঘা — পিয়ানোয় বাজল 'তারপর মোদের আরও একটি'। হার্লেকুইন তারপর তার দুবাহুর আলিঙ্গনের মধ্যে ছুটে গিয়ে উল্টে পড়ল তার ঘাড়ের ওপর, সশব্দ উল্লাসে ফেটে পড়ল সবাই। অদ্ভুত অভিনেতাটি এবার মৃত মানুষের এক স্মরণীয় অভিনয় দেখালেন, যার খ্যাতি এখনো ছড়িয়ে আছে পাটনীতে। কোন জীবন্ত মানুষ যে তার চেহারা এরকম নমনীয় করে ফেলতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস হত না। মল্লবীর হার্লেকুইনটি তাকে বস্তার মত দোলাল, মুগুরের মত ঘোরাল আর ছুঁড়ল। সাথে সাথে পিয়ানো বেজে চলল যত উদ্ভট হাস্যকর সুরে। কপট কনস্টেবলটিকে ধরে যখন হার্লেকুইন জমিতে আছাড় দিল তখন ক্লাউন মশাই বাজালেন 'তোমার স্বপন হতে মম উত্থান'। যখন তাকে পিঠে চড়ালো, তখন বাজল 'মম স্কন্ধে মম গাঁঠারি'। এবং শেষ পর্যন্ত যখন হার্লেকুইন তাকে সশব্দে মাটিতে ফেলে দিল, তখন পিয়ানোর ক্ষ্যাপা বাজনদারটি যে সুরের তরঙ্গটি তুললেন অনেকে মনে করেন তা ছিল 'পাঠিয়েছিলাম প্রেয়সীকে পত্র, যাবার পথে তাই দিলাম ফেলে'।

এই মানসিক মাৎস্যন্যায়ের চরম মুহূর্তে ফাদার ব্রাউনের দৃষ্টি হঠাৎই গেল পুরোপুরি ঢেকে। কারণ তাঁর সামনের মহানগরের ধনকুবেরটি সটানই দাঁড়িয়ে উঠে উন্মত্তের মত সমস্ত পকেট হাঁতড়াতে আরম্ভ করলেন। অসহায়ভাবে হাঁতড়াতে হাঁতড়াতে উদ্বেগে বসে পড়েই ফের দাঁড়িয়ে পড়লেন। মুহূর্তের জন্যে মনে হল বুঝি তিনিও এবার ফুটলাইট ডিঙিয়ে ভেতরে যাবেন। কিন্তু পরিবর্তে পিয়ানোয় বসা ক্লাউনটির প্রতি একটি জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আরো বেশ কয়েকমিনিট এই অপেশাদার হার্লেকুইনটির কিম্ভুত অথচ সুন্দর নাচ দেখলেন ফাদার ব্রাউন। নিখাদ অথচ সরল শিল্পকুশলতার সঙ্গে নাচতে নাচতে হার্লেকুইন দরজা পেরিয়ে পৌঁছে গেল জ্যোৎস্নালোকিত নিস্তব্ধ বাগানে। ফুটলাইটের আলোয় দেখা রাঙতা আর নকল জড়োয়ার জোড়াতালি পোযাকের জমকালো বাহুল্য কেমন গেল পাল্টে, উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে নৃত্যরত মূর্তিটিকে আরো মায়াময়, আরো রজতকান্তি মনে হত লাগল।

দর্শকদের সোচ্ছ্বাস প্রশংসার যতিচিহ্ন সবে পড়েছে কি পড়েনি, ফাদার ব্রাউন সহসা হাতে কার স্পর্শ অনুভব করলেন, নিম্নস্বরে শুনলেন তাঁর কর্নেলের পড়ার ঘরে ডাক পড়েছে। উদ্বিগ্ন মনে আহ্বানকর্তার পশ্চাদ্গামী হলেন তিনি। মনের সে ভাব আদৌ দূরীভূত হল না পড়ার ঘরের হাস্যকর অথচ নিরানন্দ পরিবেশে পৌঁছে। একদিকে বসে প্যান্টালুনের বেশধারী কর্নেল অ্যাডামস। মাথায় তাঁর কিম্ভূত শিরোভূষণ। কিন্তু বিষাদক্লিষ্ট চোখদুটির বিষণ্ণ দৃষ্টি সম্বিত ফেরাবে অতিবড় লম্পটেরও। অন্যপাশে ম্যান্টেলপিসে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে উৎকণ্ঠায় হাঁপাচ্ছেন স্যার লিওপোল্ড ফিশার।

- আমার বলতে খুব খারাপ লাগছে ফাদার ব্রাউন — বললেন অ্যাডামস — কিন্তু আমরা বিকেলবেলা যে হীরেগুলো দেখেছিলাম, সেগুলো আমার বন্ধুর টেলকোটের পকেট থেকে উধাও হয়ে গেছে। আপনি যেহেতু —

আকর্ণ বিস্তৃত হেসে বাকিটা যোগ করলেন ফাদার ব্রাউন,

- আমি যেহেতু ওনার পেছনেই ছিলাম -

- খবর্দার, এ ধরনের অভব্য ইঙ্গিত কেউ করবে না — ফিশারের দিকে এমন কঠিন দৃষ্টি হেনে বললেন অ্যাডামস, যে স্পষ্ট বোঝা গেল যে সে ধরণের ইঙ্গিত ইতি:পূর্বে অবশ্যই কেউ করেছে — ভদ্রলোক হিসেবে শুধু আপনার কাছে একটু সাহায্য চাই।

- যেমন ধরুন পকেট উল্টে দেখানো। বললেন ফাদার ব্রাউন, এবং লেগে গেলেন পকেট খালি করতে। বেরোল কিছু খুচরো পয়সা, একটা রিটার্ন টিকিট, একটা খুদে রুপোর ক্রশ, একটা ছোট প্রার্থনাপুস্তক আর একটুকরো চকলেট।

বেশ খানিক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন কর্নেল অ্যাডামস। তারপর

বললেন,

- সত্যি বলতে কি, আপনার পকেটের চেয়ে আপনার মাথার ভেতরটা দেখতে পারলেই বেশী সুবিধে হত আমার। আমার কন্যাটি যে আপনার মতানুগামী তা আমার অজানা নেই। আর ইদানীং সে —

- ইদানীং সে - চেঁচিয়ে উঠলেন ফিশার - পিতৃগৃহের দরজা খুলে দিয়েছে একটা নির্মম সমাজবাদীকে, যে প্রকাশ্যে বলে বেড়ায় যে সে ধনীদের যথাসর্বস্ব হাতাতে প্রস্তুত। এ ব্যাপারে এর বেশী আর কি বলার আছে — লুন্ঠিতধন ধনী মানুষটি তো আপনার সামনেই রয়েছে।

- আমার মাথার ভেতরটা দেখতে চাইলে দেখতে পারেন - ক্লান্তকণ্ঠে বললেন ফাদার ব্রাউন - তার মূল্য কতটা তা না হয় পরে জানাবেন। কিন্তু সে অকেজো আধারটির প্রথম বস্তুটি হল এই : হীরক তস্কররা সমাজবাদের বুলি আওড়ায় না। উল্টে বরঞ্চ তার সমালোচনাই করে থাকে তারা।

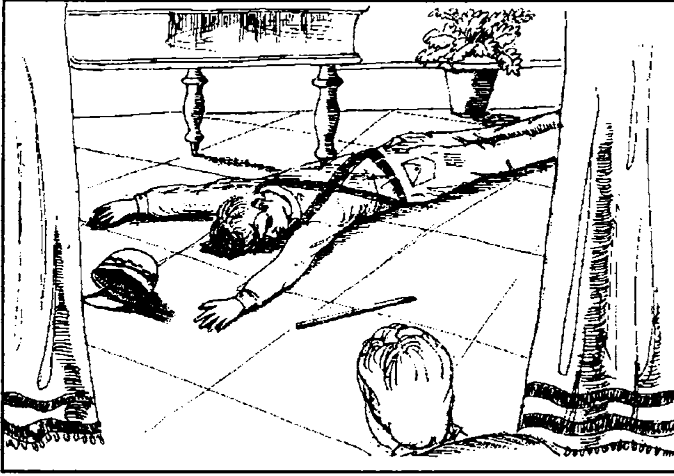
চমকে উঠলেন বাকি দুজন, কিন্তু তবু বলে চললেন ফাদার ব্রাউন।

- দেখুন মোটামুটি এখানে সবাইকে আমরা চিনি, ওই সমাজবাদীটির পক্ষে হীরে চুরি পিরামিড চুরির মতই অসম্ভব। আমাদের উচিত আজকের যে একটি মাত্র লোককে আমরা চিনি না, তার খোঁজ নেওয়া, যে লোকটা পুলিশ সেজেছিল — ফ্লোরিয়ান, সে কোথায় এখন বলতে পারেন ?

প্যান্টালুন মশাই সটান দাঁড়িয়ে পড়ে হনহনিয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। অল্প বিরতিটুকুতে কোটিপতিটি তাকিয়ে রইলেন পাদ্রীটির দিকে এবং পাদ্রীটি তাকিয়ে রইলেন তাঁর প্রার্থনা পুস্তকের দিকে। অল্পক্ষণ বাদেই ফিরে এলেন প্যান্টালুন মশাই, গম্ভীর কণ্ঠে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন,

- পুলিশটি এখনো স্টেজে পড়ে আছে। পর্দা ছবার ওঠা নামা করেছে, তবু পড়ে আছে সে।

হাত থেকে বই পড়ে গেল ফাদার ব্রাউনের। বুঝিবা কোন এক মানসিক বিপর্যয়ের ধাক্কায় শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তিনি। তারপর তাঁর ধূসর চোখে ধীরে ধীরে দেখা দিল আলোকচ্ছটা, একটি অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন করলেন তিনি।



পুলিশটি এখনো স্টেজে পড়ে আছে।

- মাপ করবেন কর্নেল, কিন্তু আপনার স্ত্রী কবে গত হয়েছেন?

- আমার স্ত্রী! বিস্ফারিত নয়নে উত্তর দিলেন সৈনিক পুরুষ - দুমাস হল মারা গেছেন তিনি। ভাই জেমসকে শেষ দেখা দেখতে পারেননি। সে তাঁর মৃত্যুর মাত্র এক সপ্তাহ বাদে এসে পৌঁছয়।

গুলিবিদ্ধ শশকের মত দেখাল খুদে পাদ্রীর চেহারা। উত্তেজিতভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি,

- আসুন, আসুন, আমাদের এক্ষুণি ওই পুলিশটিকে দেখা দরকার।

নিম্নস্বরে কথোপকথনরত কলম্বিন আর ক্লাউনের পাশ দিয়ে অভব্যের মত সবাই দৌড়ে গেলেন পর্দা ফেলা স্টেজে। অবলুণ্ঠিত কপট পুলিশের ওপর ঝুঁকে পড়লেন ফাদার ব্রাউন।

- ক্লোরোফর্ম - উঠতে উঠতে বললেন তিনি - ঠিকই আন্দাজ করেছিলাম।

নেমে এল খানিক্ষণের বিস্ময় চকিত নীরবতা। তারপর কর্নেল ধীরে ধীরে বললেন,

- দয়া করে বুঝিয়ে বলবেন, এসবের মানে কি?

আচমকাই অট্টহাস্য করে উঠলেন ফাদার ব্রাউন। তারপর কথা বলতে গিয়েও মাঝে মাঝে কষ্ট করে হাসি চেপে রাখতে হল তাঁকে।

- মশাইরা বেশী সময় নেই, আমাকে এক্ষুণি অপরাধীর পেছনে ধাওয়া করতে হবে। কিন্তু এই পুলিশের চরিত্রে অভিনয় করা ফরাসী অভিনেতাটি, যাঁর কপট শব নিয়ে হার্লেকুইন এতক্ষণ নেচে কুঁদে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে, ইনি আসলে — কণ্ঠরোধ হয়ে গেল তাঁর, পেছনে ফিরলেন তিনি দৌড়ানোর জন্যে।

- ইনি আসলে? প্রশ্ন করলেন ফিশার।

- সত্যিকারের পুলিশ। বলে অন্ধকারে দৌড় দিলেন ফাদার ব্রাউন।

পত্রবহুল বাগানের একদম শেষ প্রান্তে নাবাল জমি আর কুঞ্জবন। নীলকান্তমণিবর্ণ আকাশ আর রজতবর্ণের চাঁদের প্রেক্ষাপটে সেখানে জলপাই আর অন্যান্য চিরশ্যামল গাছের ভিড়। এ হিম ঋতুতেও দক্ষিণাঞ্চলের উষ্ণময় বর্ণ তাদের। সবুজ জলপাই গাছের প্রফুল্ল হিন্দোল, আকাশের গাঢ় নীলবর্ণ, বিপুলাকার স্ফটিকের মত চাঁদ, সব মিলে তৈরি হয়েছে মায়াময় আবহ। আর তার মাঝে গাছের ওপরের দিকে চড়ছে অদ্ভুত এক মূর্তি। আপাদমস্তক ঝকমক করছে তার, যেন চাঁদেরই পরিচ্ছদে সেজেছে সে। চাঁদের আলো ঠিকরে যাচ্ছে তার শরীরের এক একটি অংশ থেকে। ঝকঝকে চেহারাখানা তার দুলে দুলে পৌঁছে যাচ্ছে বাগানের নিচু গাছ থেকে উঁচু আর এক গাছে। কিন্তু নিচু গাছের তলায় সন্তর্পণে এসে দাঁড়ানো এক ছায়ামূর্তির ডাকে স্তব্ধ হল তার গতি।

- ওহে ফ্ল্যাম্বো - বলল সে কণ্ঠস্বর - তোমাকে তো সত্যি সত্যিই উড়ন তারা মনে হচ্ছে। কিন্তু কি জানো, শেষ পর্যন্ত না তুমি পড়ন তারা হয়ে দাঁড়াও।

পালানোর পথ নির্বিঘ্ন জেনে ওপরের রজতবর্ণ মূর্তিটি নিচু হয়ে খর্বকায় চেহারাটির কথা শুনতে লাগল।

- এত নিপুণ কাজ বোধহয় তুমি আগে করোনি ফ্ল্যাম্বো। চালাকি করে কানাডার নাম করে তুমি প্যারিস থেকে এখানে পৌঁছলে মিসেস অ্যাডামসের মৃত্যুর মাত্র এক সপ্তাহ পরে। সে সময়ে বেশী কিছু জিজ্ঞাসা করার মতন মানসিক অবস্থা কারোরই ছিল না। উড়ন তারার খোঁজ আর ফিশারের আসার দিনও জেনে ফেললে চালাকি করে। কিন্তু তারপর যা করলে, তা শুধু চালাকি বললে

কম হবে, সত্যিই তা বিরল প্রতিভার পরিচায়ক। হীরেটা হাত সাফাই করাটা তোমার কাছে মোটেই দু:সাধ্য হয়নি, হাজারটা উপায়ে তুমি ও কাজটা করার ক্ষমতা রাখো — যেমন ফিশারের কোটে কাগজের ল্যাজ লাগানোর অজুহাতেও ওটা করে থাকতে পারো। কিন্তু তোমার কুশলতা তুঙ্গে পৌঁছল তারপর।

মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে রইল ওপরের রজতমূর্তি। পালানোর পথ খোলা থাকলেও চেয়ে রইল নিচের ব্যক্তিটির দিকে।

- হ্যাঁ - বলে চলল নিচের মূর্তি - আমি সব জানি। আমি জানি তুমি জবরদস্তি প্যান্টোমাইমের অভিনয়ই শুধু করাওনি, সেটাকে অন্য কাজেও লাগিয়েছ। তুমি চুপচাপ হীরেটা হাতানোর মতলব করছিলে। সে সময়ে তোমার কোন শাগরেদ খবর আনল যে তোমার ওপর সন্দেহের নজর পড়েছে, আর একজন দক্ষ পুলিশকর্মী তোমাকে রাতের মধ্যেই উৎখাত করার জন্য রওনা দিয়েছে। সাধারণ চোর হলে হয়ত ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিয়ে ফেরার হত। কিন্তু তুমি তো শিল্পী! তুমি বোধহয় নকল জহরতের ঝলকানির মাঝে হীরেগুলোকে লুকিয়ে রাখার ফন্দী আগে থেকেই এঁটে রেখেছিলে। কিন্তু এখন তুমি দেখলে যে তুমি যদি হার্লেকুইন সাজো তাহলে পুলিশের আর্বিভাব তার সঙ্গে বেশ মানাবে। কুশলী অফিসারটি তোমাকে ধরার জন্য পাটনী থানা থেকে রওনা দিলেন, আর এখানে এসে অদ্ভুত এক ফাঁদে পড়লেন। সামনের দরজাটা খোলা মাত্র তিনি গিয়ে পড়লেন ক্রিসমাস প্যান্টোমাইমের স্টেজে। সেখানে তাঁকে উত্তম মধ্যম দিয়ে ওষুধ দিয়ে অজ্ঞান করে দেওয়া হল, আর তা দেখে পাটনীর ভদ্রসন্তানরা সব হেসে গড়িয়ে পড়লেন। আমার তো মনে হয় না এর থেকে তুখোড় কাজ তুমি আর কিছু আদৌ করবে। যাকগে, যা হবার হয়েছে, এবার হীরেগুলো আমায় ফেরৎ দাও দিকি।

ঝকঝকে মূর্তিটি যে সবুজ ডালটিতে বসে ছিল। সেটা বুঝিবা বিস্ময়ে মর্মর ধ্বনি করল। কিন্তু তবু বলে চলল কণ্ঠস্বর।

- আমি চাই তুমি হীরেগুলো ফেরৎ দাও ফ্ল্যাম্বো। আমি এও চাই তুমি এ পথ পরিত্যাগ করো। তোমার মধ্যে এখনো তারুণ্য আছে, সততা আছে, কৌতুকবোধ আছে। কিন্তু এ পথে সে সব বেশীদিন টিকবে না। সৎ কাজের সীমানা হয়ত বা বজায় রাখা যায়, কিন্তু অসৎকাজের সীমানা বেড়েই চলে। এ পথে আছে কেবলমাত্র অধো:গতি। যে দয়ালু সে হয়ে ওঠে নির্মম, লম্পট। যে

স্পষ্টভাষী সে হয়ে ওঠে খুনী, মিথ্যাচারী। তোমার মত কত লোক দেখেছি, যারা জীবন শুরু করে সচ্চরিত্র তস্কর হয়ে, খোশমেজাজে করে ধনীর ঘরে ডাকাতি, তারপর ধীরে ধীরে তলিয়ে যায় পাঁকে। শুরুতে মরিস ব্লাম ছিল সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, ধনহীনের সম্বল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়াল ঘৃণ্য গুপ্তচর, ছিদ্রান্বেষী। দু পক্ষই যথেচ্ছ ব্যবহার করল তাকে, বদলে দিল শুধু ঘৃণা। হ্যারি বার্ক অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুরু করেছিল তার ধন আহরণ। আজ সে একটা অর্ধভূক্ত বোনের ঘাড় ভেঙে ব্র্যান্ডির পয়সা আদায় করে। বীরের মত লম্পটের দলে ভিড়েছিলেন লর্ড অ্যম্বার। এখন লন্ডনের যত শকুনের দলকে তাঁকে টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ রাখতে হয়। তোমার বহু আগে ক্যাপ্টেন ব্যারিলন নামে এক ভদ্র তস্কর ছিলেন, পাগলখানায় মারা যান। যে বিশ্বাসঘাতকের দল তাঁকে সর্বদা তাড়া করে বেরিয়েছে তাদের ভয়ে কেবল চিৎকার করতেন। আমি জানি পেছনের জঙ্গল তোমার মুক্তাঙ্গন মনে হচ্ছে। আমি জানি তুমি বাঁদরের মতই ওখানে মিলিয়ে যেতে পারো এক লহমায়। কিন্তু ফ্ল্যাম্বো, একদিন তোমার চেহারা যখন বুড়ো বাঁদরের মত হবে, ওই গাছের ওপর তুমি শীতল হৃদয় নিয়ে মৃত্যুভয় নিয়ে বসে থাকবে, তখন দেখবে এ গাছগুলোও নিস্পত্র হয়ে গেছে।



নিচু হয়ে সেগুলো তুলে নিল খর্বকায় ব্যক্তি।

নিথর নিস্তরঙ্গ সব, বুঝিবা নিচের ব্যক্তিটি ওপরের জনকে বেঁধে রেখেছে

কোন এক অদৃশ্য বন্ধনে। বলে চলল সে

- তোমার অধঃপতন আরম্ভ হয়েছে। তুমি অহঙ্কার কর যে তুমি নিষ্ঠুর কোন কাজ কর না; কিন্তু আজ তুমি অত্যন্ত নির্মম কাজ করতে চলেছ। একটি সৎ তরুণ, যার ওপর সবাই এমনিতে বিরূপ, তার ওপর তুমি সন্দেহের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে যাচ্ছ। জীবনের মত তার প্রেমিকার থেকে তাকে দিচ্ছ দুরে সরিয়ে। মৃত্যুর আগে এবার এর থেকেও নিষ্ঠুর কাজ করবে তুমি।

ঝকঝকে তিনটে হীরে খসে পড়ল ঘাসের ওপর। নিচু হয়ে সেগুলো তুলে নিল খর্বকায় ব্যক্তি। ওপরে যখন তাকাল ততক্ষণে রজত পক্ষী হাওয়া হয়ে গেছে তার সবুজ পিঞ্জর ছেড়ে।

ফাদার ব্রাউন কাকতালীয়ভাবে জহরতগুলো কুড়িয়ে পাওয়াতে অতি আনন্দ উচ্ছ্বাসে শেষ হল সেদিনের সন্ধ্যা। এমনকি স্যার লিওপোল্ড পর্যন্ত মহানুভবতার সঙ্গে ফাদার ব্রাউনকে জানিয়ে দিলেন যে যদিও তিনি নিজে অত্যন্ত উদার মতাবলম্বী, যাঁরা তাঁদের ধর্মমতের কারণে সঙ্কীর্ণমনা, তাঁদের প্রতিও তাঁর সমান শ্রদ্ধা আছে।

গলিপথের বহুরূপী

অ্যাডেলফির অ্যাপোলো থিয়েটারের পাশ দিয়ে চলে গেছে একটা গলিপথ। তার দুই দিকে একই সঙ্গে আবির্ভাব হল দুই ব্যক্তির। সন্ধ্যার দুগ্ধ ধবল সূর্যালোকে কেমন যেন এক উদার শূন্যতা। কিন্তু লম্বা গলিটা প্রায়ান্ধকার। সুতরাং ব্যক্তিদ্বয় একে অপরের চোখে গলির প্রান্তে এক একটি ছায়ামূর্তি হয়েই দেখা দিলেন। অবশ্য সে কৃষ্ণমূর্তি সত্ত্বেও দুজনের কারোরই পরস্পরকে চিনতে অসুবিধে হল না। কারণ অনবদ্য চেহারা দুজনেরই এবং একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন দুজনেই।

ঢাকা দেওয়া গলিপথটির এক প্রান্তে অ্যাডেলফির একটা খাড়াই রাস্তা। অন্যপ্রান্তে একটা চাতাল, সেখানে চোখে পড়ে সূর্যাস্তের রঙ লাগা নিচের নদীখানা। গলিপথের একদিকে নিশ্চিদ্র দেওয়াল তার পেছনের বাড়িটা একখানা থিয়েটার রেস্টুরেন্ট। অন্যদিকের দেওয়ালে দুটি দরজা, গলির এক এক প্রান্তে এক একটি। সাধারণ স্টেজের দরজা এগুলো নয়। বাছাই করা অভিনেতাদের ব্যবহারের জন্যে বিশেষ ব্যক্তিগত দরজা এগুলি। ইদানীং চালু শেক্সপীয়ারীয় নাটকের তারকাগণ আপাততঃ ব্যবহার করে থাকেন এগুলি। এধরনের বিখ্যাত ব্যক্তিদের বন্ধুদের মোলাকাত করার জন্য বা এড়ানোর জন্য এরকম ব্যক্তিগত প্রবেশ বা নিষ্ক্রমণ দ্বার প্রয়োজন হয়।

স্পষ্টতঃই আমাদের আলোচ্য ব্যক্তিদ্বয় এ ধরণের কোন বিশিষ্ট বন্ধু, কারণ এহেন দরজার কথা শুধু তাঁরা জানেন তাই নয়, এ দরজা খোলার আশাও রাখেন।

অটল আত্মবিশ্বাসে দুজনেই পা চালালেন গলির ওপরের দিকের দরজাটার দিকে, যদিও একই গতিতে নয়। গলির দুরপ্রান্তের ব্যক্তিটির গতিবেগ কিঞ্চিত দ্রুত হওয়াতে দুজনেই দরজার সামনে পৌঁছলেন একইসঙ্গে। একে অপরকে অভিবাদন জানিয়ে অপেক্ষা করলেন এক মুহূর্ত — দ্রুতগামী ব্যক্তিটির ধৈর্য্য কম, তিনি করাঘাত করলেন দরজায়।

শুধু এইটুকুতেই নয়, প্রতিটি ব্যাপারেই এক্কেবারে অন্যের বিপরীত এই দুই ব্যক্তি, যদিও কোন অংশেই কেউ কারোর চাইতে কম যান না। দুজনেই সুদর্শন, জনপ্রিয়, সমাজের উচ্চতম আসনে আসীন দুইজনেই। কিন্তু তাঁদের খ্যাতি

থেকে আরম্ভ করে তাঁদের সুদর্শন চেহারা পর্যন্ত সবেতেই অসমরূপ, অনন্য তাঁরা।

খবর যাঁরা রাখেন তাঁরা প্রত্যেকেই অবগত আছেন স্যার উইলসন সেমূরের খ্যাতি। যে কোন প্রশাসনিক কিম্বা পেশাদারী মহলের যত ভেতরে মেলামেশা করবেন ততই মোলাকাত হবে তাঁর সঙ্গে। রয়াল আকাদেমির সংস্কার থেকে শুরু করে ব্রিটিশ মুদ্রায় স্বর্ণ রৌপ্যের সমব্যবহার অবধি বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত এক কুড়ি নির্বোধ কমিটির তিনিই একমাত্র প্রখর বুদ্ধি মধ্যমণি। শিল্পেও তিনি সর্বব্যাপি। তিনি শিল্পরসিক কোন অভিজাত পুরুষ না অভিজাতবর্গের প্রিয় কোন শিল্পী, তা লোকে ঠাহর করতে পারে না - এমনই অনবদ্য তিনি। তাঁর সঙ্গে মাত্র পাঁচটা মিনিট কাটালেই আপনি উপলব্ধি করবেন যে আপনি আজীবন কাটিয়েছেন স্রেফ তাঁরই ছত্রছায়ায়।

বিশিষ্ট ব্যক্তি বলে বোঝা যায় তাঁকে তাঁর পোষাক আষাক থেকেও। একই সাথে রীতিসম্মত অথচ অনন্য তা। তাঁর উঁচু সিল্কের টুপিখানায় ফ্যাশনের কোন কমতি নেই, কিন্তু সাধারণের টুপির থেকে আলাদা তা। সামান্য বেশী উঁচু হওয়াতে সেটা বাড়িয়ে তুলেছে তাঁর স্বাভাবিক উচ্চতাকে। তাঁর দীর্ঘ কৃশ চেহারাখানা সামনের দিকে ঈষৎ ঝোঁকা হলেও তার জন্য মোটেই দুর্বল দেখায় না তাঁকে। চুল তাঁর ধূসর শ্বেত — অথচ বার্দ্ধক্যের ছোঁয়া নেই তাতে। সাধারণের চেয়ে সে চুল লম্বা হলেও মেয়েলী নয়, কোঁকড়া হলেও পাকানো নয়। তাঁর বাড়িতে টাঙানো সব প্রাচীন নৌসেনাপতিদের প্রতিকৃতির মতই দাড়ি তাঁরও ছুঁচলো — যা তাঁর চেহারায় এনেছে সামরিক পৌরুষের ছোঁয়া। থিয়েটার বা রেস্তোঁরায় যে সব ধূসর দস্তানা বা রূপো বাঁধান ছড়ি চোখে পড়ে তাদের চাইতে তাঁর দস্তানা জোড়া ইষৎ বেশী নীলাভ, ছড়িখানা ইষৎ বেশী লম্বা।

অন্য ব্যক্তি অত লম্বা নয়, অথচ বেঁটে বলা চলে না তাঁকে। সুদর্শন বলিষ্ঠ চেহারা তাঁর। চুল তাঁরও কোঁকড়া কিন্তু অত্যন্ত ছোট করে ছাঁটা। বিশাল বলিষ্ঠ মাথাখানা দিয়ে স্বচ্ছন্দে দরজা ভেঙে ফেলা চলে। তাঁর ফৌজি গোঁফজোড়া আর তাঁর কাঁধের গঠন থেকে তাঁকে চেনা যায় সৈনিক পুরুষ বলে। অথচ তাঁর নীল চোখজোড়ার সরল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নাবিকদের মতন। মুখখানা চৌকোনা তাঁর, চোয়াল চৌকোনা, কাঁধ চৌকোনা এমনকি কোটখানা পর্যন্ত চৌকোনা। সত্যি বলতে কি

সে সময়কার ব্যঙ্গ চিত্রের রীতি অনুযায়ী মিঃ ম্যাক্স বীরবম তাঁর চিত্রাঙ্কন করেছিলেন ইউক্লিডের জ্যামিতি বইয়ের প্রতিপাদ্যের আদলে।

ইনিও জনপ্রিয় ব্যক্তি। যদিও খ্যাতি তাঁর অন্যধরণের। ক্যাপ্টেন কাটলার, হঙকঙের সমর অবরোধ আর চীনের বুকে রণযাত্রার গল্প শোনার জন্য আপনার সমাজের উঁচুতলায় যাবার প্রয়োজন নেই। আপনি যেখানেই থাকুন না কেন শুনতে পাবেন তাঁর কথা। অজস্র পোষ্টকার্ডে পাবেন তাঁর ছবি। বিভিন্ন সচিত্র পত্রিকায় পাবেন তাঁর যুদ্ধের কাহিনী আর ম্যাপ। বহু গীতি মঞ্চে বা ব্যারেল অর্গানে পাবেন তাঁর সম্মানে সঙ্গীত। তাঁর খ্যাতি হয়ত বা অল্পস্থায়ী কিন্তু অন্য ব্যক্তিটির খ্যাতির চাইতে তা বহুগুন সর্বব্যাপি। অনেক বেশী অংশে জনপ্রিয় তিনি, এবং সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত সে জনপ্রিয়তা। হাজার হাজার ইংরেজ গৃহে তিনি লর্ড নেলসনের মতই ইংলন্ডের এক সুবিশাল ছত্রছায়ারূপেই মান্য। অথচ ইংলন্ডে তাঁর ক্ষমতা স্যার নেলসন সেমূরের থেকে বহু অংশে কম।

দরজা খুলে দিল একজন ভৃত্য বা সজ্জাসহায়ক। তার ভাঙাচোরা চেহারা আর অপরিচ্ছন্ন কালো কোট বড়ই বেমানান বিখ্যাত অভিনেত্রীর সাজঘরের চোখ ধাঁধানো অভ্যন্তরের সঙ্গে। সে ঘরের প্রতিটি দৃষ্টিকোন মোড়া আয়নায়, যেন কোন সুবিশাল হীরকখন্ডের অভ্যন্তর থেকে দেখা শত শত পল। বাকি অল্প কয়েকটা বিলাসবস্তু - কয়েকটা ফুল, কয়েকটা রঙিন কুশন, কয়েকখানা সাজের কাপড় সেই সব আয়নায় বহুসংখ্যায় পরিবর্ধিত হয়ে সৃষ্টি করেছে এক উন্মত্ত আরব্য রজনীর। পা ঘষে ঘষে অনুচরটি আর্শিগুলি এদিক সেদিক সরিয়ে দিলে তার ওপর আবার যেন নেচে নেচে জায়গা পাল্টাচ্ছে ঘরের সে জিনিযগুলি।

নোংরা চেহারার সজ্জাসহায়কটিকে পার্কিনসন বলে সম্বোধন করলেন দুজনেই - এবং জানতে চাইলেন মিস অরোরা রোম আছেন কিনা। পার্কিনসন জানাল তিনি অন্য ঘরে আছেন। তবে সে গিয়ে তাঁকে তক্ষুনি খবর দিচ্ছে। শুনে কুটিল হল দুই অভ্যাগতেরই ভ্রুকুটি। কারণ পাশের ঘরটি মিস অরোরার বিখ্যাত সহঅভিনেতাটির ব্যক্তিগত ঘর। এই মহিলাটি শুধু হৃদয়ে অনুরাগের আগুনই জ্বালান না, জ্বালান ঈর্ষারও।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই অবশ্য খুলে গেল ভেতরের দরজা। এই একান্ত পরিবেশেও তিনি প্রবেশ করলেন তাঁর স্বাভাবিক চলনছন্দে - যেন নৈস্তব্ধ পর্যন্ত

প্রশংসা মুখর হয়ে উঠল। পরণে তাঁর মকরত আর ময়ূরপঙ্খী রঙের অদ্ভূত পোযাক - নীলাভ সবুজ ধাতব ঝলকানি তার। মায়াবী মুখখানা ঘেরা ঘন উষ্ণ তাম্রবর্ণ চুলে - পুরুষ মানুষ, বিশেযতঃ তরুণ আর প্রৌঢ়দের পক্ষে সর্বনাশা সে মুখ। তাঁর পুরুষ সহকর্মীটি বিখ্যাত মার্কিন অভিনেতা ইসিডোর ব্রুনো এবং দুজনে মিলে প্রযোজনা করছেন মিডসামার নাইটস ড্রিমের এক কল্পনাবহুল কাব্যময় রূপ। সে নাটকের প্রধান চরিত্র টাইটানিয়া এবং ওবেরনের। অর্থাৎ তাঁর আর ব্রুনোর। স্বপ্নময় নিরুপম দৃশ্যপটের মাঝখানে, মরমী নৃত্যে কাঁচপোকার ডানার মত বার্নিশ করা তাঁর ওই সবুজ পোযাক ফুটিয়ে তোলে এক অপ্সরারাজ্ঞীর ছলনাময়ী রূপটি। কিন্তু এহেন দিবালোকে পুরুষমানুষ তাকায় শুধু তাঁর মুখের দিকেই।

বহু পুরুষকে একই বিপজ্জনক দূরত্বে সরিয়ে রেখেছে তাঁর যে দুর্জ্জেয় প্রাণখোলা হাসি তাই দিয়েই তিনি স্বাগত জানালেন দুই অতিথিকে।

কাটলার তাঁকে দিলেন তাঁর বিজয়ের মতই মহার্ঘ এক গুচ্ছ উষ্ণবর্ণ ফুল। স্যার উইলসন সেমূর অবশ্য দিলেন অন্য উপহার, তাও খানিকবাদে এবং যেন খানিক উদাসীনভাবেই। কারণ অধীর আগ্রহ দেখানো তাঁর শিক্ষাদীক্ষার বিপরীত, আর ফুলের মতন সাধারণ প্রত্যাশিত বস্তু উপহার দেওয়া বিপরীত তাঁর রীতিবর্জ্জিত রীতির। তিনি বললেন, তাঁর হাতে এসে পড়েছে একটা তুচ্ছ জিনিয, যদিও সেটা বেশ দুষ্প্রাপ্য। বস্তুটি মাইসেনীয় যুগের একটি প্রাচীন গ্রীক ছোরা। সম্ভবতঃ ব্যবহৃত হত থিসিয়াস এবং হিপোলিটার সময়ে। সেকালের সমস্ত অস্ত্রের মত এটিও তৈরি পেতলে - কিন্তু অদ্ভূতভাবে আজও কাউকে আঘাত করার পক্ষে যথেষ্ট তীক্ষ্ণ। গ্রীক ফুলদানির মতই নিখুঁত এর পত্রাকার গড়নই তাঁকে আকর্ষিত করেছিল। মিস রোমের যদি এ বিষয়ে কোন আগ্রহ থাকে, বা নাটকে যদি কোনরকম কাজে লাগে তাহলে তিনি আশা করবেন যে মিস রোম —

দড়াম করে খুলে গেল ভেতরের দরজা। আর্বিভাব হল একটি বিশালদেহী মানুযের। মনস্বী সেমূরের চেহারা ক্যাপ্টেন কাটলারের বিপরীত বটে, কিন্তু এ ব্যক্তির চেহারা তার চাইতেও অধিক বিপরীত। ছ ফুট ছ ইঞ্চি লম্বা পেশীবহুল চেহারা, পরণে ওবেরনের চিতাছাল আর স্বর্ণাভ বাদামী পোযাক - ইসিডর ব্রুনোর



সেকালের সমস্ত অস্ত্রের মত এটিও তৈরি পেতলে।

রূপ বুঝি বা কোন বর্বর দেবতার মতই। ভর দিয়ে দাঁড়ালেন তিনি এক ধরনের শিকারী বর্শার ওপর। নাট্যমঞ্চে দূর থেকে এ বস্তু দেখায় ক্ষীনাকার রুপোর কাঠির মতই - কিন্তু এহেন ক্ষুদ্র জনবহুল প্রকোষ্ঠে ভল্লের মতই ভয়ঙ্কর লাগছিল সেটির আকৃতি। প্রাণবন্ত কালো চোখজোড়া তাঁর অস্থির এক আগ্নেয় ঘুর্ণনে। তামাটে সুদর্শন মুখখানায় উঁচু হনু আর মজবুত সাদা দাঁতের পাটি ইঙ্গিত দেয় তাঁর আমেরিকার দক্ষিণ আবাদভূমিতে জন্মের। যে আবেগপূর্ণ ডমরুকণ্ঠ তাঁর মন কেড়েছে বহু দর্শকের, কথা বললেন তিনি সেই স্বরেই ;

— অরোরা, তুমি কি -

ইতস্ততঃভাবে থেমে গেলেন তিনি, কারণ দরজায় আর্বিভাব হয়েছে ষষ্ঠ এক ব্যক্তির। এ পরিবেশে তাঁর চেহারাখানা হাস্যোদ্দীপকভাবে বেমানান। রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীর কালো উর্দী পরণে খর্বকায় চেহারা, যেন প্লাবন তরণী থেকে নেমে আসা এক কাঠের নোয়া। তাঁকে অবশ্য এ ব্যাপারে আদৌ সচেতন বলে মনে হল না, ভাবলেশহীন কণ্ঠে ভদ্রভাবে তিনি শুধু বললেন।

— মিস রোম আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

এহেন আবেগবিহীন বাধায় কিন্তু চড়ে গেল সবার আবেগের উত্তাপের পারা। তুষার লাগা পোষাকে কোন আগন্তুকের আগমন ঘটলে যেমন টের পাওয়া যায় যে ঘরের উত্তাপ মাত্রা ছাড়িয়েছে তেমনই এই পেশাদারী ব্রহ্মচারীটির উদাসীনতায় সবাই উপলব্ধি করলেন যে তাঁরা প্রমোদাসক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর মতই তাঁদের সবার আকাঙ্খিত নারীটিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন পুরুষটির উপস্থিতিতে মিস রোমও টের পেলেন যে বাকি প্রত্যেকেই ভালবাসে তাঁকে — এক একজন এক একরকম সর্বনাশা ভাবে। আদিম বন্যের বা আবদেরে শিশুর ক্ষুধা দিয়ে ভালবাসেন অভিনেতাটি। অমনস্বী পুরুষের সরল স্বার্থপরতা দিয়ে ভালবাসেন সৈনিক প্রবরটি, ভোগী পুরুষের সখের প্রতি গভীর আকর্ষণ দিয়ে ভালবাসেন স্যার উইলসন। এমনকি তাঁর পায়ে পায়ে ঘোরা পার্কিনসন, তিনি যাকে চেনেন সফলতা পাবার অনেক আগে থেকেই, সেও তাঁকে ভালবাসে প্রভুভক্ত কুকুরের নীরব বিমুগ্ধতা দিয়ে।

কালো কাঠের নোয়াটি সকৌতুকে আরও একটি ব্যাপার লক্ষ্য করেও গোপন করে গেলেন নিজের মনোভাব। যশস্বী অরোরা পুরুষের খোশামোদ যতই পছন্দ করুন না কেন, অনুরাগী পুরুষকটিকে ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলে শুধু মাত্র নিস্পৃহ পুরুষটির সঙ্গে একলা হতে পারলে বাঁচেন। অবশ্য তাঁর অনুরাগী না হলেও খর্বকায় পাদ্রীটিকে একেবারে নিঃস্পৃহ বলা চলেনা। কারণ তিনি অরোরা যে মোহিনী কূটকৌশলে তাঁর কার্যোদ্ধার করতে আরম্ভ করলেন তাঁতে মুগ্ধ না হয়ে পারলেন না। অরোরা রোমের বুদ্ধি খেলে একটি মাত্র ব্যাপারেই — তা হল পুরুষমানুষ। পাদ্রীমশাই দেখতেই থাকলেন, কেমন করে তিনি সুনিপুণ সেনাপতির মতই সবাইকে চিরবিদায় না দিয়েও একে একে দ্রুত বিদায় করলেন। বিশালদেহী ব্রুনোর বোধ এমন শিশুর মত, যে তাকে স্রেফ একটু বেজারভাব দেখালেই দরজা আছড়ে বিদায় নেবে সে। ব্রিটিশ অফিসার কাটলারের মাথায় ইশারা ইঙ্গিত সহজে ঢোকে না, কিন্তু সামাজিক শিষ্টাচারের ব্যাপারে অতিশয় যত্নবান তিনি। ইশারা তিনি কিচ্ছু বুঝবেন না, কিন্তু কোন মহিলার অনুরোধ মরে গেলেও এড়াতে পারবেন না। সেমূর ভায়ার ব্যাপার অবশ্য আলাদা — তাঁকে ভাগাতে হবে সবশেষে। তাও তাঁকে বন্ধুর মত বুঝিয়ে, সবাইকে বিদায় দেবার কারণটি বুঝিবা তাঁকে সঙ্গোপনে জানিয়ে। মিস রোম একই ধাক্কায় যেভাবে এ তিনটে কাজ সারলেন তাতে মুগ্ধ না হয়ে পারলেন না পাদ্রী মশাই।

ক্যাপ্টেন কাটলারের কাছে গিয়ে মিস রোম মধুমাখা কণ্ঠে বললেন,

— এগুলো নিশ্চই আপনার প্রিয় ফুল, তাইতো এরা দামী আমার কাছে। কিন্তু আমার প্রিয় ফুল ছাড়া তো এরা সম্পূর্ণ হবে না। ওই কোনের দোকান থেকে কয়েকটা লিলি নিয়ে আসুন তো। তারপর দেখুন না পুরোটা কেমন সুন্দর দেখায়।

তাঁর কৌশলের প্রথম উদ্দেশ্য, ব্রুনোকে ক্ষেপিয়ে তাড়ানো সফল হল সাথে সাথেই। ব্রুনো মশাই তখন প্রায় রাজভঙ্গীমায় হতশ্রী পার্কিনসনের হাতে বর্শাখানা রাজদণ্ডের মত ধরিয়ে দিয়ে একখানা গদি আঁটা চেয়ারে সিংহাসনের মতই বসতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি এরকম অবারিত অনুরোধে ক্রীতদাসসুলভ ঔদ্ধত্যে জ্বলে উঠল তাঁর দুগ্ধধবল অক্ষিগোলক। মূহুর্তের জন্য তিনি মুষ্টিবদ্ধ করলেন তাঁর তামাটে হাতজোড়া, তারপর দরজাখানা খুলে বিদায় নিলেন নিজের ঘরে। ইতিমধ্যে মিস অরোরার ব্রিটিশ বাহিনীকে বিদায় করার প্রচেষ্টা যতটা সহজ বলে ভাবা গিয়েছিল ততটা সহজে সফল হয় নি তা। দরজা অবধি বিনা টুপিতেই কাটলার বুঝি বা কারোর অমোঘ নির্দেশে এগিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু একখানি আর্শিতে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো সেমূরের চেহারায় না জানি ছিল কি চালিয়াতি আর বাবুয়ানির ছাপ যে দরজার সামনেই আটকে গেলেন তিনি। হতভম্ব বুলডগের মতন দেখতে লাগলেন এদিক সেদিক।

— এ বুদ্ধুটাকে দেখিয়ে দিই কোথায় যেতে হবে। অনুচ্চকণ্ঠে বললেন অরোরা। তারপর দৌড়ে গেলেন দোরগোড়া অবধি অতিথিটিকে দ্রুত বিদায় করতে।

তাঁর সেই কেতাদুরস্ত উদাসীন ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে শুধু চুপচাপ শুনে গেলেন সেমুর। মহিলাটি যখন চেঁচিয়ে কাটলারকে কয়েকটা নির্দেশ দিলেন, তারপর গলির উল্টোদিকে, যেদিকে টেমসের ওপর চাতাল আছে, দৌড় দিলেন, তখন খানিক স্বস্তিবোধও করলেন। কিন্তু এক মুহুর্তবাদেই চিন্তার রেখা পড়ল তাঁর কপালে। তাঁর মত উঁচুমানের লোকের শত্রুর কমতি নেই, তাছাড়া তাঁর খেয়াল হল গলির অন্যপাশটাতে রয়েছে ব্রুনোর ঘরে ঢোকার দরজা। অবশ্য আত্মমর্যাদা খোয়ালেন না তিনি। ওয়েস্টমিনিস্টার ক্যাথিড্রালে বাইজান্টিয় স্থাপত্যের পুন:প্রয়োগের ব্যাপারে ফাদার ব্রাউনের সাথে দু একটা মার্জিত বাক্যালাপের

পর খুব সহজভাবেই যেন বেড়াতে বেড়াতে রওনা দিলেন গলির ওপরের দিকে। একা পড়ে রইলেন শুধু ফাদার ব্রাউন এবং পার্কিনসন - যাঁদের দুজনেরই রুচি নেই অনাবশ্যক বাক্যালাপে। সজ্জসহায়কটি স্রেফ ঘুরে বেড়ালো ঘরময়। আর্শিগুলোকে কখনো বা আনলো টেনে, কখনো দিল ঠেলে। রাজা ওবেরনের বর্ণোজ্জ্বল পৌরাণিক বর্শাখানা হাতে থাকাতে আরো অপরিচ্ছন্ন মনে হতে লাগল তার কালো কোটপ্যান্ট। যতবার একখানা আয়না নাড়াচাড়া করল সে ততবারই সেই অলীককক্ষে আর্বিভাব হল ফাদার ব্রাউনের নতুন এক একটি মূর্তির। কখনো তিনি শূন্যে ভাসছেন দেবদূতের ভঙ্গীমায় মাথা নিঁচু করে, কখনো বা ডিগবাজী খাচ্ছেন বাজীগরের মত, আবার কখনো পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছেন অভদ্রের মত।

ফাদার ব্রাউন অবশ্য সম্পূর্ণ উদাসীন তাঁর এই প্রতিমূর্তির অদ্ভুত সমারোহের প্রতি। অলস দৃষ্টিতে তিনি শুধু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলেন পার্কিনসনকে, যতক্ষন না সে তার ওই বিচিত্র বর্শাখানা নিয়ে উধাও হল পাশের ক্লনোর ঘরে। তারপর তাঁর যেমন সখ, মগ্ন হলেন তিনি যত বিমূর্ত বিষয়ের ধ্যানে। বিশ্লেষণ করতে লাগলেন আর্শিগুলোর কৌনিক অবস্থান, তাদের প্রতিফলনের কৌনিক দশা আর দেওয়াল আর আর্শির মাঝের কৌনিক ব্যবধান। কিন্তু হঠাৎই কানে এলো তাঁর কার উচ্চকণ্ঠে রুদ্ধশ্বাস চিৎকার - লাফিয়ে উঠে আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলেন তিনি। সাথে সাথেই ঘরে ছিটকে ঢুকলেন স্যার উইলসন সেমূর — চেহারা সাদা হয়ে গেছে তাঁর।

— গলিতে ও লোকটা কে? আমার ছোরাখানাই বা কোথায়? চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। ভারী বুটজোড়া পায়ে ফাদার ব্রাউন ঘুরে দাঁনানোর আগেই হন্যে হয়ে ঘরে অস্ত্রখানা খুঁজতে লাগলেন তিনি। কিন্তু সেটা বা অন্যকোন অস্ত্র খুঁজে পাবার আগেই দরজায় আর্বিভাব হল কাটলারের চৌকো মুখখানার। হাতে উদ্ভটভাবে আঁকড়ে রয়েছেন তিনি একগুচ্ছ লিলি। চেঁচিয়ে বললেন - কি হচ্ছে এসব? গলিতে ওই জানোয়ারটা কি? এসব কি আপনার কোন চালাকি নাকি?

— আমার চালাকি? ফুঁসে উঠলেন তাঁর পাণ্ডুরবর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী। লম্বা পায়ে এগিয়ে গেলেন তাঁর দিকে।

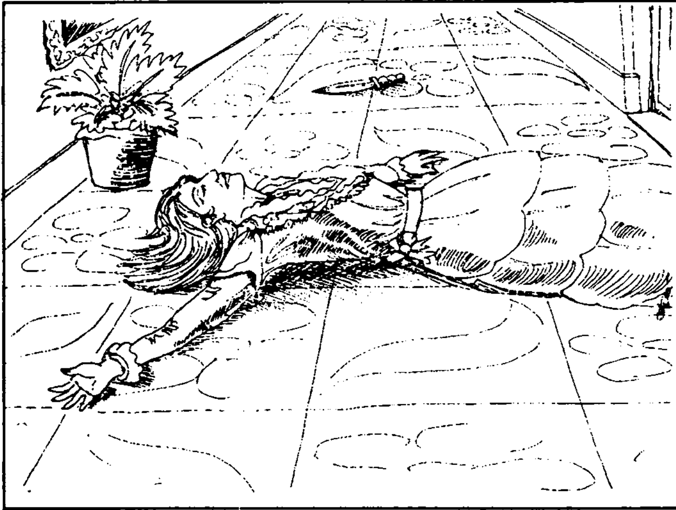
ফাদার ব্রাউন ততক্ষনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন গলিতে। গলির ওপর নিচ দেখেছেন চোখ বুলিয়ে, তারপর চোখে কি পড়াতে দ্রুতপায়ে হাঁটা দিয়েছেন সেই দিকে।

তাই দেখে নিজেদের ঝগড়া ভুলে তাঁর পেছনে দৌড়লেন বাকি দুইজন। কাটলার চেঁচিয়ে বললেন,

— করছেন কি আপনি ? কে মশাই আপনি ?

— আমার নাম ব্রাউন, বিষন্ন কণ্ঠে বললেন পাদ্রীমশাই। কিছুর ওপর ঝুঁকে পড়ে আবার দাঁড়ালেন সোজা হয়ে। বললেন,

— মিস রোম আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন, আমি এলামও যত তাড়াতাড়ি পারি, কিন্তু তাও দেখছি দেরি হয়ে গেল।



লুটিয়ে পড়ে আছেন অরোরা রোম।

সবাই তাকালেন নিচের দিকে। বিকেলেন পড়ন্ত আলোটুকু সমস্ত গলিটাতে ছড়িয়ে রয়েছে সোনার নদীর মত, আর তার মাঝখানে সোনালী সবুজ উজ্জ্বল পোষাকে। মৃত মুখখানা ওপরের দিকে করে লুটিয়ে পড়ে আছেন অরোরা রোম। বুঝিবা খানিক লড়াই করেছিলেন তিনি, জামার খানিকটা তাই ছিঁড়ে অনাবৃত

হয়ে গেছে ডানদিকের কাঁধটা। কিন্তু রক্ত গড়িয়ে পড়ছে শরীরের অন্যদিকের একটা ক্ষতচিহ্ন থেকে। মাত্র কয়েকগজ দুরেই পড়ে পেতলের ঝকঝকে ছোরাখানা।

বেশ কিছুক্ষনের জন্যে নেমে এল নিঃসীম নিস্তব্ধতা। দুর থেকে ভেসে এল চেরিং ক্রুস কোন ফুলওয়ালীর হাসি। শোনা গেল স্ট্রাণ্ডের কোন রাস্তায় ট্যাক্সির জন্যে কেউ প্রাণপনে শিষ দিচ্ছে। তারপর ক্যাপ্টেন কাটলার তীব্র আবেগে নাটুকে কায়দায় হঠাৎই চেপে ধরলেন স্যার উইলসন সেমূরের গলা। কিন্তু স্থির দৃষ্টিতে সেমূর শুধু তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে। সংঘাত বা ত্রাসের বিন্দুমাত্র চিহ্ন দেখা গেল না তাঁর মধ্যে। শুধু শীতল কণ্ঠে বললেন,

— আমাকে মারার কোন প্রয়োজন নেই আপনার। ও কাজটা আমি নিজেই করব।

ইতস্তত: করে হাত নামিয়ে নিলেন ক্যাপ্টেন। সেই একই শীতল কণ্ঠে অন্যজন অকপটভাবে বলে চললেন,

— যদি দেখি ছুরি দিয়ে ও কাজ করার সাহস আমার নেই। তাহলে এক মাসের মধ্যে সেরে ফেলব মদ দিয়েই।

— মদে আমার হবে না - উত্তর দিলেন কাটলার - কিন্তু মরার আগে আমি রক্তদর্শন করে যাব। আপনার নয়, তবে কার আমি জানি।

বাকিরা তাঁর উদ্দেশ্য বোঝার আগেই তিনি কুড়িয়ে নিলেন ছোরাখানা, তারপর লাফিয়ে গেলেন গলির অন্য দরজাটার দিকে। এক ধাক্কায় হুড়কো ভেঙে খুলে ফেললেন দরজা, ব্রুনোর সাজঘরে ঢুকে চড়াও হলেন তার ওপর। একইসাথে সেই দরজা দিয়ে স্খলিত চরণে বেরিয়ে এলো বুড়ো পার্কিনসন। নজর পড়ল তার গলিতে পড়ে থাকা লাসটার ওপর। কম্পিতপদে সে এগিয়ে গেল মৃতদেহের দিকে। দুর্বল দৃষ্টিতে আবেগতাড়িত মুখে তাকিয়ে দেখল সেটার দিকে। তারপর ফের স্খলিতচরণে সাজঘরে গিয়ে সহসা বসে পড়ল একখানা জমকালো গদিআঁটা চেয়ারে। ফাদার ব্রউনও তার দিকে দৌড়লেন সঙ্গে সঙ্গেই। ঘরখানা তখন ক্যাপ্টেন এবং বিশালকায় অভিনেতাটির দ্বৈরথের শব্দে সরব — ছোরাখানা নিয়ে লড়াই করছেন তাঁরা। কিন্তু সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করলেন না তিনি। সেমূরের মধ্যে তখনো কিছু হিতাহিত জ্ঞান অবশিষ্ট ছিল। তিনি গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে পুলিশের

জন্য শিষ দিতে লাগলেন।

পুলিশ এসে কোনমতে ছাড়াল দৃঢ়বদ্ধ দুই যুযুধান মল্লকে। তারপর যৎসামান্য তদন্তের পর ক্রোধান্ধ কাটলারের অভিযোগে গ্রেপ্তার করল ইসিডর ব্রুনোকে। সাংবাদিকতার বোধ খানিক পুলিশেরও থাকে। একজন দেশবরেণ্য নেতার হাতে একজন অপরাধীর গ্রেপ্তারের তাৎপর্য নজর এড়াল না তাদের। কাটলারের সঙ্গে ব্যবহার করল তারা খুব সম্ভ্রমের সঙ্গেই। এমনকি তাঁর হাতে একটা ছোট ক্ষতের দিকেও তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ভুলল না তারা। কাটলার যখন ব্রুনোকে উল্টোনো চেয়ার টেবিলের ওপর দিয়ে একরকম ঠেলেই নিয়ে যাচ্ছিলেন। সে তাঁর হাত থেকে ছোরাখানা কেড়ে নিয়ে তাঁকে জখমি করে দিয়েছিল কবজির ঠিক নিচেই। আঘাত গুরুতর নয়, কিন্তু যতক্ষন না প্রায় বন্য বন্দীটিকে পুলিশ ঘর থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। ততক্ষন সে ওই গড়িয়ে পড়া রক্তের দিকে একনাগাড়ে হাসিমুখে চেয়ে রইল।

— ব্যাটা একেবারে সাক্ষাৎ নরখাদক, তাই না? কনস্টেবলটি চুপিচুপি প্রশ্ন করল কাটলারকে।

উত্তর দিলেন না কাটলার, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত বাদে হঠাৎই বললেন,

— আমাদের এখন উচিত ... মৃতদেহের একটা বন্দোবস্ত ....

কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল তাঁর।

— দুটি মৃতদেহের। ঘরের অন্যপাশ থেকে ভেসে এল পাদ্রীমশায়ের গলা — আমি এর কাছে পৌঁছে দেখি এ হতভাগাও শেষ হয়ে গেছে।

জমকালো চেয়ারের ওপর কুঁকড়ে বসে থাকা বেচারা পার্কিনসনের চেহারাটির দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। মৃতমহিলার প্রতি শিল্পময় ভাবেই যেন শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছে সে।

নীরবতা ভাঙলেন কাটলার। বিষন্নতায় ভারাক্রান্ত কর্কশ কণ্ঠে বললেন,

— ও না হয়ে আমি হলেই ভাল হতো। আমি দেখেছি, উনি যখন হাঁটতেন। ওই একা চেয়ে থাকত ওনার দিকে। উনি ছিলেন ওর প্রাণবায়ু। সেটাই ফুরিয়ে যেতে মারা পড়েছে ও।

— আমরা সবাই মারা পড়েছি। রাস্তার দিকে তাকিয়ে এক অদ্ভুত কণ্ঠে বললেন সেমূর।

বড় রাস্তার কোনে দাঁড়িয়ে তাঁরা বিদায় নিলেন ফাদার ব্রাউনের কাছে। নেহাৎ যদি কোন অভব্য আচরণ করে থাকেন তার জন্যে চাইলেন ক্ষমাও। বিষাদের ছাপ তাঁদের দুজনের মুখেই।

ফাদার ব্রাউনের মগজের খোপে খোপে নানা চিন্তার বাস। মাঝে মধ্যে তারা হঠাৎই এমন লাফ দিয়ে ওঠে যে তাদের নাগালই পাওয়া মুস্কিল হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে এমনই একটা চিন্তা হঠাৎই দেখা দিয়েই এমন অদৃশ্য হল যে ফাদার ব্রাউন এ দুজনের দুঃখ সম্বন্ধে নিশ্চিত হলেও তাদের নির্দোষিতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারলেন না।

ভারী গলায় সেমূর বললেন,

— এবার যাওয়া যাক তাহলে, আমাদের যা সাহায্য করা সম্ভব তাতো করেছি।

নিরীহ কণ্ঠে ফাদার ব্রাউন বললেন,

— আমি যদি বলি আপনাদের আঘাত করার জন্যে যা কিছু সম্ভব তা আপনারা করেছেন, তাহলে আমার কথা বুঝতে পারবেন কি?

এমন চমকে উঠলেন দুজনে যেন তাঁরাই অপরাধী। তীক্ষ্ম কণ্ঠে কাটলার বললেন,

— কাকে আঘাত করার জন্যে?

— আপনাদের নিজেদেরকেই - উত্তর দিলেন পাদ্রীমশাই - আপনাদের সাবধান করে দেওয়া উচিত না মনে করলে আপনাদের কষ্ট আর বাড়াতাম না। যদি এই অভিনেতাটি খালাস পায়, তাহলে আপনারা নিজেদের ফাঁসী দেবার সব ব্যবস্থাই করে রেখেছেন। আমাকে যদি সাক্ষী দিতে ডাকে তাহলে আমাকে বাধ্য হয়ে বলতেই হবে যে চিৎকারের পর আপনারা দুজনে উন্মত্তের মত ঘরে ছুটে এসে ঝগড়া বাধিয়েছিলেন। আমার সাক্ষ্যের হয়ত মানে দাঁড়াবে যে খুনটা আপনাদের দুজনেরই কেউ একজন করে থাকতে পারেন। তাছাড়া ক্যাপ্টেন

কাটলার আঘাতও পেয়েছেন ওই ছোরাটা থেকেই।

— আঘাত পেয়েছি। অবজ্ঞার সঙ্গে তেড়ে উঠলেন ক্যাপ্টেন মশাই — একটা ছোট্ট কাটা কেবল!

সম্মতিতে মাথা নেড়ে পাদ্রী বললেন,

— হ্যাঁ, কিন্তু রক্ত পড়েছে সেখান থেকেই, আর পেতলের ছোরাতেও আছে রক্ত। আর তাই এখন বোঝবার কোন উপায় নেই ও ছোরাখানাতে রক্ত আগেও লেগেছিল কিনা।

নীরব হলেন সবাই খানিক্ষণের জন্যে। কথা বললেন প্রথমে সেমূর। রোজ যে পালিশ করা বাচনভঙ্গীতে কথা বলেন তিনি, তার বিপরীতভাবে জোর গলায় বললেন,

— কিন্তু আমি গলিতে একটা লোককে দেখেছিলাম।

কাঠের মত ভাবলেশহীন মুখে পাদ্রী ব্রাউন বললেন,

— আমি জানি আপনি দেখেছিলেন। দেখেছিলেন ক্যাপ্টেন কাটলারও। তাইতো ব্যাপারটা এমন অবাস্তব লাগছে।

ফাদার ব্রাউন কি বলতে চাইছেন তা ঠাহর করে উত্তর দেবার আগেই তিনি বিদায় নিলেন তাঁদের থেকে। খেঁটে ছাতাখানা ঠক ঠকিয়ে উধাও হলেন রাস্তা ধরে।

আধুনিক সংবাদপত্রের যেমন রীতি, তাদের সবচাইতে খাঁটি আর জরুরী খবর হল পুলিশের খবর। বিংশ শতাব্দীতে খুনের খবর প্রাধান্য পায় রাজনীতির চাইতেও বেশী — অবশ্য তার মূল কারণ যে খুন ব্যাপারটাই বেশ গুরুতর। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'ব্রুনো মামলা' বা 'গলিপথের রহস্য' নিয়ে লণ্ডন আর মফস্বলের কাগজগুলোতে যা তুমুল হৈচৈ হল তা সত্যি বিস্ময়কর। উত্তেজনা উঠল এমন তুঙ্গে যে কয়েকসপ্তাহ ধরে সংবাদপত্রে আলোচিত হল শুধুমাত্র সত্যি ঘটনাবলীই। বেরলো সমস্ত জেরার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য। সে সবের বর্ণনা যতই অন্তহীন বা বিরক্তিকরই হোক না কেন, সম্পূর্ণ যথার্থই বটে। তার কারণ অবশ্য এ মামলায় বিখ্যাত সব ব্যক্তিদের সমাবেশ। খুন হয়েছেন এক জনপ্রিয় অভিনেত্রী। আসামী

এক জনপ্রিয় অভিনেতা। আর আসামীকে হাতেনাতে ধরেছেন সে সময়ের জনপ্রিয় এক সৈনিকপ্রবর। এই অসাধারণ সব ঘটনাবলীর চাপে তাই সংবাদ পত্রগুলি একরকম বাধ্যই হল নিষ্ঠার সঙ্গে যথার্থ সংবাদ পরিবেশন করতে। এ মামলার বাকিটুকু তাই সহজেই জানা যায় সংবাদ পত্রে নথিভূক্ত ব্রুনো মামলার বিবরণ থেকে।

মামলার বিচারক ছিলেন মিঃ মঙ্কহাউস। যে সব বিচারকদের রসিক বলে কিঞ্চিৎ অখ্যাতি আছে তাঁদের দলেই পড়েন তিনি। কিন্তু সত্যি বলতে কি এসব বিচারকেরা কিন্তু রাশভারী বিচারকদের থেকেও বেশী কর্মশীল। কারণ রাশভারী বিচারকেরা আদতে চপল, কারণ তাঁদের অন্তঃকরণ পূর্ণ দাম্ভিকতায়। অন্যদিকে রসিক বিচারকদের চপল ব্যবহার আসে পেশাদারী গাম্ভীর্যের প্রতি অশ্রদ্ধা থেকে।

মামলার পাত্ররা সব স্বনামধন্য ব্যক্তি, তাই উকিলরাও ছিলেন হোমরাচোমরা। সরকারী পক্ষের উকিল ছিলেন স্যার ওয়াল্টার কাউড্রে — ভারিক্কী, ওজনদার কৌঁসুলী। নিজেকে কি করে খাঁটি ইংরেজ এবং বিশ্বাসযোগ্য বলে জাহির করতে হয় ভালই জানেন। এমন ভালই জানেন কেমন করে কপট অনীহার সাথে করতে হয় বাগ্মীতা। আসামীপক্ষের উকিল মিঃ প্যাট্রিক বাটলার। অনেকে অকর্মার ঢেঁকি বলে মনে করেন তাঁকে — অবশ্য শুধু তারাই যাঁরা তাঁর আইরিশ চরিত্র বোঝেন না বা কখনো তাঁর জেরার মুখে পড়েননি।

ডাক্তারি প্রমাণের ব্যাপারে কোনরকম বিতর্কের সৃষ্টি হল না। ঘটনাস্থলে সেমূর যে ডাক্তারটিকে ডেকেছিলেন, দেখা গেল তিনি এবং যে খ্যাতনামা শল্যচিকিৎসটি মৃতদেহ পরীক্ষা করেছিলেন দুজনেই একমত। অরোরা রোম নিহত হয়েছেন ছুরি বা ছোরা জাতীয় কোন ধারালো অস্ত্রে, যার ফলাখানা ছোট। আঘাত করা হয়েছে ঠিক হৃৎপিণ্ডের ওপর, এবং মৃত্যু হয়েছে তৎক্ষনাৎ। ডাক্তার যখন মৃতদেহ দেখেন তখন মৃত্যু হয়েছে সবে মিনিট বিশেক আগে। অর্থাৎ ফাদার ব্রাউন যখন মৃতদেহ দেখেন তখন মৃত্যু হয়েছে মিনিট তিনেকের আগে নয়।

এরপর পেশ হল কিছু সরকারী সাক্ষ্য প্রমাণ। মৃত্যুর আগে কোনরকম ধস্তাধস্তি হয়েছিল কি হয় নি আলোচ্য বিষয় সে সব প্রমাণের। ধস্তাধস্তির একমাত্র ইঙ্গিত জামাটা ছিঁড়ে যাওয়া। কিন্তু আঘাত এসেছিল শরীরের এমনই এক দিক থেকে এবং এমনই চূড়ান্ত সে আঘাত যে তার সঙ্গে আদপেই মেলে না এ ইঙ্গিত।

পেশ হল সমস্ত তথ্য, যদিও কোন ব্যাখা পাওয়া গেল না তাদের। তারপর ডাক পড়ল গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের প্রথমটির।

স্যার উইলসন সেমূর যেমন নিখুঁতভাবে সব কাজ সারেন, সাক্ষীও দিলেন সেইভাবে। বিচারকের থেকে বিখ্যাত হয়েও তিনি আচরণ করলেন নিরহঙ্কারভাবেই। সবাই তাঁকে প্রধানমন্ত্রী কিম্বা ক্যান্টারবেরীর আর্চবিশপের মত উঁচু নজরে দেখলেও, ব্যবহার হল তাঁর যথার্থ ভদ্রলোকের মতই। তাঁর সব কমিটির মত এখানেও তাঁর বক্তব্য রইল অত্যন্ত প্রাঞ্জল - তিনি মিস রোমের সঙ্গে দেখা করতে থিয়েটারে গিয়েছিলেন। সেখানে তার দেখা হয় প্রথমে ক্যাপ্টেন কাটলারের সঙ্গে। তার কিছু পরে তাঁদের দুজনেরই মোলাকাত হয় আসামীর সাথে এবং খানিকবাদেই সে ফেরৎ যায় নিজের সাজঘরে। এসেছিলেন একটি রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীও - খোঁজ করেছিলেন নিহত মহিলার এবং নাম বলেছিলেন ব্রাউন। মিস রোম তারপর থিয়েটারের বাইরে বেরিয়ে গলিতে দাঁড়িয়ে যে দোকান থেকে আরো ফুল আনতে হবে সেটা ক্যাপ্টেন কাটলারকে দেখিয়ে দিলেন। তিনি রইলেন ঘরেই, অল্প কয়েকটা কথা বললেন পাদ্রীর সাথে। তারপর তিনি পরিষ্কার শুনলেন যে মৃত মহিলা ক্যাপ্টেনকে তাঁর কাজে পাঠিয়ে দিয়ে ঘুরে হাসতে হাসতে দৌড় দিলেন গলির উল্টোদিকে, যে দিকে আসামীর সাজঘর। তাঁর সব বন্ধুরা কোথায় গেলেন দেখার জন্যে তিনি অনর্থক কৌতূহলবশতঃ বেড়াতে বেড়াতে গেলেন গলির মুখ অবধি, তারপর তাকিয়ে দেখলেন গলির যেদিকে আসামীর দরজা আছে সে দিকটা। কিছু দেখেছিলেন কি তিনি গলিতে? হ্যাঁ দেখেছিলেন বইকি গলিতে।

অল্পক্ষনের জন্যে নাটুকে বিরতি দিলেন স্যার ওয়াল্টার কাউড্রে, তাঁর সাক্ষীটি তাকিয়ে রইলেন নিচের দিকে — সাধারণতঃ আত্মসংযমী হলেও অন্যসময়ের তুলনায় এখন কিঞ্চিৎ বেশী পাণ্ডুরই লাগল তাঁর চেহারা। তারপরে ফের প্রশ্ন করলেন উকিলমশাই। তাঁর অনুচ্চ কণ্ঠস্বরে সহানুভূতির রেশ থাকলেও কেমন ভুতুড়ে শোনাল তা,

— ভাল করে দেখেছিলেন তো?

স্যার উইলসন সেমূরের মানসিক অবস্থা যতই বিচলিত হোক, বুদ্ধি তাঁর সবসময়ের মতই প্রখর। বললেন,

— আউট লাইনটা দেখেছি খুব স্পষ্টভাবেই। কিন্তু আউটলাইনের ভেতরে কি আছে তা ভালভাবে দেখতে পারিনি। গলিখানা এমন লম্বা যে মাঝখানে কেউ দাঁড়ালে গলির অন্যপ্রান্ত থেকে আসা আলোয় সম্পূর্ণ কালো দেখায় তাকে।

স্থির চোখজোড়া নামিয়ে নিলেন তিনি, তারপর ফের বললেন,

— আমি ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিলাম আগেই যখন ক্যাপ্টেন কাটলার প্রথম গলিতে ঢোকেন।

আবার খানিকক্ষণের জন্যে নেমে এল নীরবতা। ঝুঁকে পড়ে নোট নিলেন বিচারক।

ধৈর্য্য সহকারে স্যার ওয়াল্টার প্রশ্ন করলেন,

— আচ্ছা, আউটলাইনটা কেমন দেখতে ছিল? মৃত মহিলার অবয়বের মত ছিল কি?

— আদপেই না। শান্তভাবে বললেন সেমূর।

— আপনার কি মনে হল তাহলে?

— আমার মনে হল কোন দীর্ঘদেহী পুরুষমানুষ।

এজলাস শুদ্ধু লোক নিজের নিজের চোখ আটকে রাখলেন নিজের কলম, ছাতার বাঁট, বই বা জুতোর ওপর, বা অন্য যা কিছুর ওপর তাঁদের দৃষ্টি ছিল। কিন্তু তবুও কাঠগড়ায় দাঁড়ানো ব্রুনোর বিশাল চেহারার অস্তিত্ব টের পেলেন সবাই। এমনিতেই সে দীর্ঘদেহী, কিন্তু তার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে যেন আরো দীর্ঘাকার হয়ে উঠল সে।

তাঁর কালো রেশমের আলখাল্লা আর সাদা রেশমের পরচুলখানা সমান করে নিয়ে বসতে যাচ্ছিলেন কাউড্রে। স্যার উইলসন দু একটা নিয়মমাফিক কাজ সেরে নামতে যাচ্ছিলেন সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে, এমন সময়ে আসামীর উকিল হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বাধা দিলেন তাঁকে।

মি. বাটলারের গ্রাম্য চেহারা, রক্তিম ভ্রু এবং নিদ্রাচ্ছন্নের মত মুখের ভঙ্গী। বললেন,

— আপনাকে আমি বেশীক্ষণ আটকাব না। আপনি ধর্মাবতারকে কি জানাবেন, যে আপনি কি করে বুঝলেন যে আপনি যাকে দেখেছেন সে পুরুষমানুষ।

মৃদু মার্জিত হাসি খেলে গেল সেমূরের মুখে। বললেন,

- বুঝলাম তার রুচিহীন ট্রাউজারখানা দেখে। যখন লম্বা দুখানা ঠ্যাঙের মাঝখান দিয়ে দিনের আলো দেখতে পেলাম তখন শেষ পর্যন্ত নিশ্চিত হলাম যে সে পুরুষমানুষই।

বাটলারের নিদ্রাবিষ্ট চোখজোড়া হঠাৎই খুলে গেল কোন নীরব বিস্ফোরণে। ধীরে ধীরে বললেন,

- শেষ পর্যন্ত। তাহলে প্রথমদিকে বোধহয় ভেবেছিলেন অবয়বটি কোন নারীর।

এই প্রথম দেখা গেল সেমূর ফ্যাসাদে পড়েছেন। বললেন,

- ব্যাপারটা খুবই তুচ্ছ। কিন্তু ধর্মাবতার যখন আমার মতামত জানতে চান তখন বলতেই হবে। সে অবয়বে এমন কিছু ছিল যা সম্পূর্ণ নারীসুলভ নয় অথচ আবার ঠিক পুরুষ মানুষের মতনও নয়। অবয়বের বঙ্কিম রেখাগুলো কেমন অন্যধরণের। তাছাড়া মনে হল লম্বা চুলও রয়েছে

- ধন্যবাদ। বলে বসে পড়লেন মিঃ বাটলার, যেন তিনি পেয়ে গেছেন যা প্রয়োজন।

ক্যাপ্টেন কাটলার স্যার উইলসন সেমূরের মত অত আত্মসংযমী বা বাগ্মী সাক্ষী নন। কিন্তু দেখা গেল তাঁর গোড়ার দিকের ঘটনাবলীর বিবরণ সম্পূর্ণ এক। বর্ণনা দিলেন তিনি কেমন করে ব্রুনো ফেরৎ গেল তার সাজঘরে, তিনি রওনা হলেন লিলি ফুল কিনতে। তিনি ফেরৎ এলেন গলির মুখে, গলিতে দেখলেন সেই চেহারা। সন্দেহ করলেন প্রথমে সেমূরকে। তারপর লড়াই করলেন ব্রুনোর সঙ্গে। তবে যে কালো ছায়ামূর্তি তিনি আর সেমূর দেখেছেন সে সমন্ধে তিনি বলতে পারলেন সামান্যই। যখন তাঁকে সে অবয়বের আউটলাইন সমন্ধে প্রশ্ন করা হল। সেমূরের প্রতি কটাক্ষ করে তিনি জানালেন যে তিনি চিত্রসমালোচক নন। যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হল যে সে মূর্তি পুরুষের না নারীর। তিনি অভিযুক্তের দিকে দাঁত খিঁচিয়ে জানালেন যে সে চেহারা কোন পশুর মতই। বোঝা গেল যে

ভদ্রলোক কাতর হয়ে পড়েছেন ক্রোধে এবং শোকে। তাছাড়া সমস্ত ঘটনাও বোঝা যাচ্ছিল অত্যন্ত পরিস্কার ভাবেই — তাই কাউড্রে তাকে নিস্কৃতি দিলেন তাড়াতাড়িই।

আসামী পক্ষের উকিলও জেরা করলেন অল্পই। যদিও তাঁর যেমন ধাত, মনে হল সময় নিলেন খানিক বেশীই। নিদ্রাবিষ্ট দৃষ্টিতে কাটলারের দিকে তাকিয়ে বললেন,

- পুরুষ বা নারীর চাইতে সেটাকে বরং পশুর মতন দেখতে বলে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন?

বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়লেন কাটলার। বললেন,

- আমার হয়তো ও কথাটা বলা উচিত হয় নি। কিন্তু ব্যাটার যদি শিম্পাঞ্জীর মত চওড়া কুঁজো কাঁধ হয়। আর মাথায় যদি খোঁচা খোঁচা চুল হয় শূয়োরের মত —

তাঁর অদ্ভুত অধৈর্য্য বিবরণ মাঝপথেই থামিয়ে দিলেন মিঃ বাটলার। বললেন,

- মাথার চুল শূয়োরের মত কিনা সে কথা ছাড়ুন। মহিলার মত ছিল কি?

চেঁচিয়ে উঠলেন সৈনিক পুরুষ

- মহিলার মতন! মোটেই না।

- আগের সাক্ষী কিন্তু তাই বলে গেছেন — দ্রুত মন্তব্য করলেন আসামী পক্ষের উকিল — তাছাড়া সে অবয়বে যে অর্ধনারীসুলভ বঙ্কিম রেখার কথা আগে বলা হয়েছে সে সব কিছু ছিল নাকি? সেকি কোন নারীসুলভ বঙ্কিমরেখা ছিল না? আপনি বলছেন সে অবয়বের চেহারা সাধারণের চেয়ে চওড়া, চৌকোনা?

- হয়ত সে সামনের দিকে ঝুঁকে ছিল। কর্কশ অনুচ্চ কন্ঠে বললেন কাটলার।

- কিম্বা হয়ত ঝুঁকে ছিল না। বলে এই দ্বিতীয়বারও সহসা বসে পড়লেন বাটলার।

স্যার ওয়াল্টার কাউড্রের তৃতীয় সাক্ষী খর্বকায় ক্যাথলিক পাদ্রীটি। অন্যদের



তৃতীয় সাক্ষী খর্বকায় ক্যাথলিক পাদ্রীটি।

চাইতে উচ্চতায় এতই ছোট যে কোনমতে কাঠগড়ার ওপর অবধি পৌঁছাল তাঁর মাথা। বুঝিবা জেরা করা হচ্ছে কোন বালককে। কিন্তু তাঁর বংশগত ধর্মবিশ্বাসের দরুন স্যার ওয়াল্টার দুর্ভাগ্যবশতঃই ধরেই নিলেন যে যেহেতু আসামীটি বদমাইস, বিদেশী এবং হয়ত আংশিক কৃষ্ণাঙ্গও তখন ফাদার ব্রাউন নিশ্চয় তার পক্ষে। সুতরাং ফাদার ব্রাউন কোন কিছুর ব্যাখা করতে গেলেই তেড়ে উঠলেন তিনি। — তাঁকে উত্তর দিতে বললেন স্রেফ হ্যাঁ কিম্বা না তে এবং বললেন তিনি কোনরকম ধর্মীয় রঙ ছাড়াই শুধু চাঁচাছোলা তথ্যগুলো জানতে চান। ফাদার ব্রাউন যখন সরল মনে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে গলিপথের ব্যক্তিটি বলে কাকে তিনি সন্দেহ করেন, উকিল মশাই তাঁকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে তাঁর ব্যক্তিগত ধারনায় তাঁর কোন প্রয়োজন নেই।

- গলিতে একটা কালো অবয়ব দেখা গেছে। সে আকৃতি আপনি দেখেছেন বলছেন। কিরকম আকৃতি ছিল সেটা?

বুঝিবা ধমক খেয়ে চোখ পিটপিট করলেন ফাদার ব্রাউন। কিন্তু নির্দেশ পালন করতে তিনি বহুকাল ধরেই অভ্যস্ত। তাই বললেন,

- সে আকৃতি খর্বকায়, স্থূলাকার, দুপাশে বিস্তৃত তার শিঙের মত খোঁচা

দুটি অঙ্গ, আর —

- ও শিং সমেত সাক্ষাৎ শয়তান নিশ্চই! বিজয়ী ব্যঙ্গের ভঙ্গীতে মন্তব্য করে বসে পড়লেন কাউড্রে — শয়তান স্বয়ং বোধহয় প্রোটেস্টান্টদের খেতে এসেছিল!

- না - উদাসীন ভাবে বললেন পাদ্রীমশাই — আমি জানি সে কে।

এজলাস শুদ্ধু সবার মনে তখন অলীক অথচ প্রত্যক্ষ কোন এক অতিমানবিক অস্তিত্বের চিন্তা। গলির সে আকৃতি দিয়েছেন তিন তিনজন কুশলী শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তাঁরা বুঝিবা সে আকৃতি দেখেছেন কোন এক সদা পরিবর্তনশীল দুঃস্বপ্নের মতনই। একজন তাকে বলেছেন নারী, একজন বলেছেন পশু, আবার অন্য একজন বলেছেন শয়তান।

ফাদার ব্রাউনের দিকে তীক্ষ্ণ স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন বিচারক। বললেন,

- আপনি দেখছি অদ্ভূত ধরণের সাক্ষী। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে আপনি সত্যি কথাই বলবেন। বলুন তো গলিতে যাকে দেখেছিলেন সে কে?

- সে ব্যক্তিই আমিই। বললেন ফাদার ব্রাউন।

এক অত্যাদ্ভুত নীরবতার মাঝে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন বাটলার। শান্তকণ্ঠে বললেন,

- ধর্মাবতার কি আমাকে একবার জেরা করার সুযোগ দেবেন? তারপর না থেমেই ফাদার ব্রাউনের দিকে ছুঁড়ে দিলেন একটি অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন — আপনি তো ছোরাখানার কথা শুনেছেন। জানেন নিশ্চই যে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে খুন করা হয়েছে কোন একটা ছোট ফলা দিয়ে।

প্যাঁচার মত গম্ভীরভাবে সম্মতিতে মাথা নাড়লেন ফাদার ব্রাউন। বললেন,

- ফলাখানা ছোট, তবে হাতলখানা বিরাট লম্বা।

দর্শকরা সবে বোঝার চেষ্টা করছেন যে পাদ্রীমশাই স্বচক্ষে লম্বা হাতল সমেত একটা ছোট্ট ছোরা দিয়ে খুন হতে দেখেছেন কিনা, ফাদার ব্রাউন তড়িঘড়ি বাকিটাও ব্যাখা করতে আরম্ভ করলেন,

- মানে বলছি কি, ছোট ফলা তো ছোরারই থাকে না, বর্শারও থাকে।

বর্শার ডগাতেও ছোরার মত ইস্পাতের ফলা লাগানো থাকে, বিশেষতঃ যদি নাটকের সৌখীন বর্শা হয়। হতভাগা বুড়ো পার্কিনসন ওই বর্শা দিয়েই বউকে খুন করেছে। বেচারী বউটা সবে আমাকে পারিবারিক ঝামেলা মেটানোর জন্য ডেকে পাঠিয়েছিল। কি করব — ইশ্বর মার্জনা করুন, আমার পৌছতে দেরি হয়ে গেল, কিন্তু সে বেচারাও অনুতাপে মারা গেল — অনুতাপেই মারা গেল সে। কৃতকর্মের বোঝা সহ্য করতে পারল না।

এজলাসে সবার ধারণা হল যে কাঠগড়ায় বসা বাচাল পাদ্রীটির নিশ্চই মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। কিন্তু বিচারক মশাই চোখে কৌতূহল নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন উজ্জ্বল স্থির দৃষ্টিতে। আসামী পক্ষের উকিলও অবিচলভাবে চালিয়ে গেলেন তাঁর জেরা। বললেন,

- পার্কিনসন যদি নাটকের বর্শা দিয়েই খুন করে থাকে, তাহলে নিশ্চই কম করে চারগজ দুর থেকে আঘাত করেছে। তবে কাঁধের জামা ছেঁড়ার মত ধস্তাধস্তির চিহ্নের ব্যাখা করবেন কি করে?

নিজের অজান্তেই বাটলার ফাদার ব্রাউনের প্রতি সাধারণ সাক্ষীর বদলে বিশেষজ্ঞের মতই ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। কিন্তু তা কারোরই নজরে পড়ল না এসময়ে।

সাক্ষীটি উত্তর দিলেন,

- বেচারী ভদ্রমহিলার পেছনে একটা খুলে যাওয়া তক্তায় জামাটা আটকে ছিঁড়ে গিয়েছিল সেটা। তিনি জামাটা ছাড়ানোর সময়ে টানাটানি করছেন, এমন সময় পার্কিনসন আসামীর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বর্শা বিঁধিয়ে দেয়।

- তক্তা? কৌতূহলী কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন উকিল।

- তক্তার উল্টোদিকটা আয়না — বোঝালেন ফাদার ব্রাউন — আমি যখন সাজঘরে ছিলাম তখন লক্ষ্য করেছিলাম কয়েকটা আয়না গলির মধ্যে ঠেলে খুলে দেওয়া যায়।

নেমে এল বিশাল এক অদ্ভুত নীরবতা। তারপর কথা বললেন বিচারক,

- তার মানে আপনি বলতে চাইছেন যে যখন আপনি গলিতে তাকান

তখন আপনি আসলে নিজেকেই আয়নায় দেখেছিলেন?

- হ্যাঁ হুজুর, আমি সেটাই বলতে চেষ্টা করছিলাম। বললেন ফাদার ব্রাউন — কিন্তু ওনারা আমাকে আকৃতির কথা জিজ্ঞাসা করলেন। আমাদের টুপির কানাতটা শিঙের মতন উঁচু তো, তাই —

সামনে ঝুঁকে পড়লেন বিচারক মশাই। তাঁর বৃদ্ধ চোখ দুটি হয়ে উঠল আরো উজ্জ্বল। অসাধারণ পরিস্কার কণ্ঠে তিনি বললেন,

- তাহলে আপনি বলতে চাইছেন যে যখন স্যার উইলসন সেমূর বক্ররেখায় গড়া অদ্ভুত কি একটা দেখেছিলেন, যার চুল নারীর মত এবং ট্রাউজার পুরুষের মত, তিনি দেখেছিলেন স্যার উইলসন সেমূরকেই?

- আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। বললেন ফাদার ব্রাউন।

- আর আপনি বলতে চান যে যখন ক্যাপ্টেন কাটলার একখানা শিম্পাঞ্জী দেখেছিলেন যার কাঁধ কুঁজো আর চুল শূয়োরের মত, তখন তিনি দেখেছিলেন স্রেফ নিজেকেই?

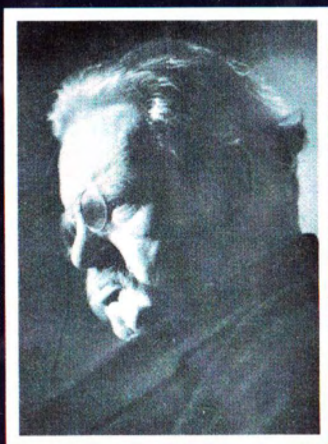
- আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।

যুগপৎ প্রশংসা এবং ব্যঙ্গের ভঙ্গীতে চেয়ারে আরাম করে হেলান দিলেন বিচারক। প্রশ্ন করলেন,

- আমায় কি বলতে পারেন যে কি করে আপনি আর্শিতে আপনার নিজের চেহারা চিনতে পারলেন, অথচ সেই একই কাজ পারলেন না দু দুটি সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি?

যেন খুব কষ্টে চোখ পিটপিট করলেন ফাদার ব্রাউন। তোতলাতে তোতলাতে বললেন,

- সত্যি বলতে কি আমি ঠিক জানি না হুজুর ...., বোধহয় আমি অত ঘন ঘন আয়না দেখি না বলে।



গিলবার্ট কিথ চেস্টারটন
১৮৭৪—১৯৩৬

ইংরেজ লেখক চেস্টারটনের জন্ম লণ্ডনে, ২৯শে মে ১৮৭৪ সালে। পড়াশোনা সেণ্ট পলস স্কুলে, স্কুলে পড়ার সময়েই নজরে পড়ে তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা। আর্ট শিখতে ঢোকেন স্লেড স্কুলে, এবং এখানে পড়তে পড়তেই আলাপ হয় তাঁর আর্নেস্ট হডার উইলিয়ামসের সাথে। তাঁরই অনুরোধে লেখেন দুএকটি বইয়ের রিভিউ, এবং সূত্রপাত হয় তাঁর সাহিত্যিক জীবনের। সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে ছিল তাঁর অবাধ গতি। লিখেছেন ব্রাউনিং এবং ডিকেন্সের ওপর সমালোচনা, একগুচ্ছ নভেল, বহু প্রবন্ধ এবং কবিতা। ১৯১০ থেকে লিখতে আরম্ভ করেন রহস্য গল্প, যার প্রধান চরিত্র ফাদার ব্রাউন। ফাদার ব্রাউন একটি অতি সাদামাটা ইংরেজ রোমান ক্যাথলিক পাদ্রী, এবং নিজের ধর্মীয় পেশাটির প্রতি সম্পূর্ণ নিবেদিত প্রান হয়েও তিনি রহস্যানুসন্ধানে অদ্বিতীয়। আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে হাবাগোবা মনে হলেও, তাঁর তীক্ষ্ম বুদ্ধির কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় অপরাধীরা। এই চরিত্র সৃষ্টির অনুপ্রেরণা চেস্টারটন পান সম্ভবতঃ তাঁর ঘনিষ্ঠ রোমান ক্যথলিক বন্ধু ফাদার জন ওকনরের কাছ থেকে, যাঁর সাথে তাঁর প্রথম আলাপ ১৯০৩ সনে। ১৯৩৬ সনে তাঁর মৃত্যু অবধি চেস্টারটন ফাদার ব্রাউনকে নিয়ে লেখেন মোট আটচল্লিশটি গল্প। তার থেকে বাছাই করা পাঁচটি গল্প নিয়ে আমাদের এই প্রচেষ্টা।